হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি

মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি

ছয়টি প্রাপ্তমনস্ক ডার্ক ফ্যান্টাসি

একমিনিট! শুনুন!

যে প্রিয় পানীয়তে আপনি আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছেন, আপনি নিশ্চিত তো তাতে এমন কিছু মেশানো নেই যার কথা জানলে কেঁপে উঠবে আপনার শরীর? যে শরীর আপনি ছুঁতে চলেছেন, আপনি নিশ্চিত তো সত্যিই তার শরীর আছে? ঠোঁট রাখতে চলেছেন যে ঠোঁটে, সেই চুম্বন শেষ চুম্বন নয়তো? অথবা যে কস্তুরীর আবেশে আপনি হারিয়ে যাচ্ছেন স্বপ্নের দেশে, সেখান থেকে আবার ফিরে আসতে পারবেন তো? কারণ, মৃত্যুর গন্ধ অনেক সময় মিষ্টি হয়। যাঁর আবাহনের প্রতীক্ষায় আপনার সাধনা, সে এমন কেউ নয়তো যে অপদেবতার চেয়েও ভয়ঙ্কর! স্বর্গ নয়, মর্ত্য নয়, সে আসলে অন্য অচেনা পৃথিবীর বাসিন্দা? তাকে খালি হাতে ফেরানো যায় না!

ছয়টি নভেলেট ও গল্প নিয়ে এই সংকলন—মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি। এক্ষণে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এ কাহিনিগুলি সে ধরনের গল্প, যাকে বলা হয় ডার্ক ফ্যান্টাসি। বাস্তব ও পরাবাস্তব আধারিত এই বীভৎস রসের গল্প উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সুখী গৃহকোণ ও নবকল্লোল পত্রিকাতে। এবার সব একসঙ্গে স্থান পেল এক মলাটে।

সাহিত্যের বিভিন্ন রসের মধ্যে বীভৎস রসও একটা রস। তবে হ্যাঁ, কেউ এই বই পাঠ করে আতঙ্কিত হলে, কোনও পানীয়তে চুমুক দেবার আগে বা কাউকে স্পর্শ করার আগে হঠাৎ থমকে গেলে, সুগন্ধির গন্ধ সহ্য করতে না পারলে তার দায় কিন্তু লেখকের নেই। কারণ, এ বই পাঠ করার পরে তেমন সম্ভাবনা থাকতেই পারে। তবে মনে হয়, পাঠকরা এই কাহিনিগুলি উপভোগ করবেন। মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টিই হয়!

১লা জানুয়ারি ২০২০

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

নিরন্তর উৎসাহ, প্রেরণা দেন যিনি,

সেই অগ্রজ কথাসাহিত্যিক প্রচেতদা,

প্রচেত গুপ্তকে

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

সূচিপত্র

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

কর্ণসুবর্ণর কড়ি
মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি
অ্যাডভেন ৪
জীবন্ত উপবীত
রাক্ষুসে নেকড়ে
অপরাজেয়
প্রথম সূর্য শশাঙ্ক
বন্দর সুন্দরী
খাজুরাহ সুন্দরী
চন্দ্রভাগার চাঁদ
ফিরিঙ্গি ঠগি

কাকবাবার বামা

রিসর্টের লনে দাঁড়িয়ে দূরে গাছে ঘেরা একটা জায়গা দেখিয়ে রুস্তম জানতে চাইল, 'ওই উঁচু জায়গাটাতে কী আছে? এখানে দেখার মতো কিছু আছে?'

রিসর্টের ম্যানেজার স্থানীয় লোক। সে জবাব দিল, 'ওই জায়গাটার আড়ালে একটা ছোট নদী আছে সেটা দেখে আসতে পারেন। তাছাড়া এখানে দেখার মতো কিছু নেই। আপনাদের মতো কলকাতা থেকে যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা সাধারণত রেস্ট নিতে আসেন।'

পুলক কথাটা শুনে মৃদু আপশোসের ভঙ্গিতে বলল, 'যাঃ কিছুই তবে দেখার নেই!'

পুলকের কথা শুনে ম্যানেজার লোকটা মৃদু চুপ করে থেকে একটু যেন ইতস্তত করে বলল 'ওই জঙ্গলের মধ্যে কাকবাবার ঘর আছে। যাঁরা সাধুসন্তে বিশ্বাস করেন তাঁরা কেউ কেউ দেখা করে আসতে পারেন তাঁর সঙ্গে। আপনারা ইচ্ছা করলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেন। তবে গেলে বেলা থাকতেই যাবেন। সন্ধ্যা নামলে সাধুবাবা আর কুঁড়েতে থাকেন না। নদীর পাড়ে চলে গিয়ে ধ্যানস্থ হন।'

সাধু-সন্তের ওপর আস্থা বা বিশ্বাস রুস্তম বা পুলকের মধ্যে নেই। তবে ম্যানেজার লোকটার কথা শুনে রুস্তম হেসে ফেলে বলল, 'কাকবাবা!' বেশ অদ্ভুত নাম তো! এমন নাম কেন?'

লোকটা জবাব দিল, 'সাধুবাবার পোষা চারটে দাঁড়কাক আছে। ওরা সাধুবাবার কথা শোনে। সাধুবাবার ''কাক বিদ্যা'' জানা আছে। ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। তাঁর ওই দাঁড়ককগুলোর জন্যই লোকে তাঁকে ''কাকবাবা'' বলে। কাকবাবা প্রেতসিদ্ধ সাধু।'

সাধুবাবা কাক পোষে! এ কথাটা শুনে এবার রুস্তম আর পুলক একসঙ্গে হেসে ফেলল। আর তা দেখে লোকটা সম্ভবত অনুমান করল যে সাধু-টাধুদের সম্পর্কে এই শহুরে লোকদুটোর কোনও বিশ্বাসই নেই। এ ব্যাপারটা তাদের কাছে বলা তার ঠিক হয়নি। কাজেই সাধুবাবার প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে লোকটা বলল, 'এবার আমি যাচ্ছি স্যার। আপনাদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।'—এই বলে রিসর্টের ভিতরে চলে গেল লোকটা।

পুলক গত রাতে এসে উঠেছে এই রিসর্টে। বেশ কিছুদিন ধরে অফিসে কাজের খুব চাপ যাচ্ছিল। হাঁফিয়ে উঠেছিল পুলক। মনটা ঠিক করতে দু-এক দিনের জন্য বাইরে ঘুরে আসার, একটু নিরিবিলিতে থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তার। ইন্টারনেটে এই জায়গাটার হদিশ পেয়ে সোজা কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে এখানে চলে এসেছে। রুস্তমও এসেছে কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে। তবে গত রাতে নয়। আজ কাক-ভোরে। তাদের দুজনের এই রিসর্টেই আলাপ। দুজনেই তারা সমবয়সি। বয়স তিরিশের আশপাশে। সুতরাং তাদের মধ্যে আলাপও জমে উঠেছে তাড়াতাড়ি। ঘণ্টা তিনেকের পরিচয়তেই পরস্পরের সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসেছে। তাছাড়া তারা দুজন ছাড়া অন্য কোনও কথা বলারও লোক নেই এখানে। এটা ট্যুরিস্ট সিজন নয়। তাদের দুজনের দুটো ঘর ছাড়া অন্য কোনও কর্মচারীও নেই। ম্যানেজারকেই একা হাতে ম্যানেজার, কুক, গেটম্যান সবার কাজ করতে হচ্ছে।

ম্যানেজার লোকটা চলে যাবার পর রুস্তম জনশূন্য রিসর্ট আর চারপাশের ফাঁকা পরিবেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইস! জায়গাটা এমন ফাঁকা জানলে কলকাতা থেকে কাউকে তুলে আনতাম। একবার ভেবেও ছিলাম কথাটা। পরে ভাবলাম, না থাক। আজকাল তো সব সময় সব জায়গাতে লোকজন থাকে। হয়তো চেনা কোনও লোকের মুখে পড়ে যাব, তখন বিপত্তি হবে।'

রুস্তমের কথাটা পুরোপুরি বুঝতে না পেরে পুলক বলল, 'কাকে তুলে আনতে?'

পুলকের কথার জবাবে রুস্তম তার গলার মোটা সোনার চেনটাতে হাত বোলাতে বোলাতে কোনও রাখঢাক না করেই বলল, 'কোনও মেয়েকে। গতকাল রাতে যখন এখানে আসছি তখন মাঝরাতে হাইওয়ের গায়ে একটা ধাবায় গাড়ি থামিয়েছিলাম চা খাওয়ার জন্য। সেখানে একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ট্রাক ড্রাইভার খদ্দের ধরার আশায়। বললে সে নিশ্চয়ই এখানে আসতে রাজি হয়ে যেত। ফেরার সময় আবার তাকে জায়গামতো নামিয়ে দিতাম।'

রুস্তমের কথা শুনে একটু অবাক হল পুলক। আর এ ব্যাপারটা সম্ভবত ধরতে পেরেই এরপর রুস্তম বলল, দেখ ভাই, জীবন সম্পর্কে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট। পরলোকে বিশ্বাস নেই, তাই পাপের ভয় নেই। আমি শুধু ইহলোকে বিশ্বাসী। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ জীবনটাকে চেটেপুটে উপভোগ করতে চাই। জীবনের তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। কখন কী হয় কে বলতে পারে? এই যে আমার বাঁ পা-টা একটু খুঁত হয়ে গেল। আমাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে কেন জানো? চাঁদনীর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎই একটা ট্যাক্সি রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতে উঠে এসে আমার পায়ের পাতা মাড়িয়ে চলে গেল! আর একটু হলেই তো সব শেষ হয়ে যেত। কাল যে আমার জীবনে আবার মৃত্যু হানা দেবে না সে কথা কে বলতে পারে? তখন আমার এত বড় ইলেকট্রনিক্স গুডসের ব্যবসা, ব্যাঙ্কে জমানো টাকা কোনও কাজে আসবে না। বিয়ে-থা করিনি, বাপ-মাও কোন কালে উপরে চলে গিয়েছেন। একা মানুষ। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি জীবনকে ভোগ করে যেতে চাই।'—একটানা কথাগুলো বলে থামল রুস্তম।

পুলক সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—'বুঝলাম।'

রুস্তম এরপর দূরের গাছে ঘেরা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘরে বসে আর কী করব? সঙ্গে বোতল আছে বটে, তবে আমি দিনের বেলা মদ্যপান করি না। তার চেয়ে চলো ওই জায়গাটা থেকে ঘুরে আসা যাক।' পুলক বলল, 'ওই জঙ্গলে গাড়ি যাবে না। তোমার হাঁটতে সমস্যা হবে না?'

রুস্তম বলল, 'না, তেমন কিছু হবে না। তাছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ মতো আমাকে প্রতিদিন নিয়মিত হাঁটতে হয়। অপারেশনের পর যাতে পায়ের পেশিগুলো ঠিক হয় তার জন্য। ওই হাঁটার জন্যই ছ'মাসে পা-টা অনেকটাই ঠিক হয়ে এসেছে।'

পুলক আর রুস্তম এরপর বেরিয়ে পড়ল রিসর্ট থেকে।

২

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে গাছে ঘেরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছে গেল দুজন। একটা পায়ে চলা পথ এগিয়েছে ভিতর দিকে। তারা অনুমান করল, এ পথটাই সম্ভবত গাছগুলোর ভিতর দিয়ে এগিয়েছে নদীর পাড়ের দিকে। সেই পথেই প্রবেশ করল তারা। কিন্তু সেখানে ঢোকার পরই তাদের মনে হল যেন বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তারা। চারপাশে কী বিশাল বিশাল সব প্রাচীন গাছ! তাদের ডালপালাগুলো যেন হাত ধরাধরি করে মাথার ওপর পাতার চাঁদোয়া বিছিয়েছে। যদিও বেলা দশটা বেজে গিয়েছে, তবুও সেই প্রখর রোদ্র মাথার উপরের আচ্ছাদন ভেদ করে জায়গাটাতে তেমন ভাবে প্রবেশ করতে পারছে না। ছায়াঘেরা শীতল পরিবেশ চারপাশে। নানারকম গাছ। আম-জাম-শিমূল-বট-অশ্বত্থ। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা বটগাছের মাথার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে রুস্তম বলল, 'ওই দ্যাখো!'

পুলক দেখল সেই গাছটা থেকে বিশাল বিশাল বাদুড় ঝুলছে। কলকাতায় চিড়িয়াখানার একটা গাছ থেকে বাদুড় ঝুলতে দেখা যায়। আরও বেশ কয়েকটা জায়গাতে এর আগে বাদুড় ঝুলতে দেখেছে সে। কিন্তু এত বড় বাদুড় সে আগে কোনওদিন দ্যাখেনি। চারপাশে কেমন যেন গা-ছমছমে পরিবেশ! কিছু গাছের ফোকলা গুঁড়িগুলোকে ঠিক মানুষের মুখের মতো দেখতে। ঠিক যেন বিশাল হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। চারপাশে তাকাতে তাকাতে পুলক হেসে বলল, 'তন্ত্র-মন্ত্র সাধনার একেবারে আদর্শ জায়গা বলে মনে হচ্ছে!' রুস্তম হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ। সাধু-সন্ন্যাসীরা শ্মশান বা এসব নির্জন স্থানে ডেরা বাঁধে সাধারণ মানুষকে স্থানমাহাত্ম্য দ্বারা প্রভাবিত করার জন্য।'

বেশ কিছুটা পথ এগোবার পরই মাথার উপরের গাছের চাঁদোয়া হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল। বনের মধ্যে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা। তারপর আবার পথ এগিয়েছে উল্টোদিকের গাছের দঙ্গলের ভিতর দিয়ে। তবে সেই ফাঁকা জায়গার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে দরমার বেড়া আর মাথায় শনের চাল দেওয়া একটা কুঁড়েঘর। তার কাঠের দরজার পাল্লাটা খোলা। ঘরের লাগোয়া একটা বেদি মতো জায়গা আছে। সেখানে একটা ত্রিশূল পোঁতা। ঘরটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। তবে কোনও সাধুবাবা বা কাক-টাক চোখে পড়ল না তাদের।

ঘরটার দিকে তাকিয়ে রুস্তম বলল, 'নিশ্চয়ই এটা সেই কাকবাবার ডেরা। চলো একবার লোকটাকে দেখা যাক। মনে হয় লোকটা ঘরের ভিতরে আছে।'

তার কথা শুনে পুলক মৃদু বিস্মিত ভাবে বলল, 'তুমি ওর কাছ থকে ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে চাও নাকি?'

রুস্তম বলল, 'ধ্যুস! নিছক কৌতূহল। লোকটাকে আর তার কাকগুলোকে একবার দেখতে চাই। আর যদি ওর কাছে গাঁজা পাওয়া যায় তবে কলকেতে দু'টান দেব। কলেজ লাইফে সিগারেটে ভরে খেতাম। বহুদিন খাইনি।' পুলক বলল, 'আচ্ছা চলো।' কুঁড়েঘরটার দিকে এগোল তারা।

ঘরটার কাছে পৌঁছে আরও একবার ঘরের সামনে একপাশে ত্রিশূল পোঁতা বেদিটার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজন। মাটির তৈরি বেদিটার উপর ত্রিশূলটার সামনে বেশ কয়েকটা নরকরোটি আর শুকনো জবা ফুল ছড়ানো। সিঁদুরেরও চিহ্ন আছে জায়গাটাতে। ভালো করে সে দিকে তাকিয়ে

পুলক চাপা স্বরে বলল, 'পাঁচটা খুলি আছে দেখছি। তন্ত্র সাধনাতে পঞ্চমুণ্ডির আসন বলে একটা কথা আছে শুনেছি। যেখানে বসে শবসাধনা করা হয়। এটা সাধুবাবার সাধনা স্থল বলে মনে হয়।'

এরপর কয়েক পা হেঁটে সেই কুঁড়ের খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। পুলক একটা জিনিস খেয়াল করল। ঘরের দরজা আর তার চারপাশের মাটিতে সাদা রঙের পাখির বিষ্ঠা ছড়িয়ে আছে। কাকের বিষ্ঠা কিনা কে জানে? মুহূর্তখানেক খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল তারা। ঘরের ভিতর থেকে কোনও শব্দ আসছে না। তারপর একটু ইতস্তত করে তারা উঁকি দিল ঘরের ভিতর।

দরজার উল্টোদিকে একটা জানলা দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরের ভিতরে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভিতরটা। একপাশে একটা খাটিয়ার উপর খড়ের বিছানা। মেঝেতে রাখা মাটির হাঁড়ি, সরা, টুকিটাকি কিছু বাসনপত্র। তবে সেই সাধু নেই ঘরের মধ্যে। কুঁড়ের ভিতরে চারপাশে তাকাতে তাকাতে তাদের চোখ হঠাৎই থেমে গেল ঘরের এক কোণে। সেখানে দরমার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাটিতে বসানো আছে একটা নরকঙ্কাল। মাথায় তার সিঁদুর লেপা, গায়ে লাল পাড় সাদা শাড়ি জড়ানো। হয়তো বা কোনও নারীর কঙ্কালই হবে। সাধুবাবার সাধনার কাজে লাগে হয়তো কঙ্কালটা।

ঘরের ভিতর কাউকে দেখতে না পেয়ে রুস্তম মৃদু আশাহত ভাবে বলল, 'লোকটা মনে হয় অন্য কোথাও গিয়েছে। ফেরার সময় দেখব ওর দেখা পাওয়া যায় কিনা! চলো এবার নদীর দিকে যাওয়া যাক।'

সাধুর ঘর ছেড়ে আবার গাছপালার ফাঁক গলে এগোল তারা। কিছু সময়ের মধ্যে তারা সত্যি পৌঁছে গেল নদীর পাড়ে।

একটা শীর্ণকায় নদী তিরতির করে বয়ে চলেছে। এ পাশে তার গায়ে ভাঁট-থানকুনি আর ধুতুরার ঝোপঝাড়। নদীর ওপারে আবার বড় বড় গাছের জঙ্গল। সূর্যের আলোতে চিক চিক করছে নদীর জল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। জল থেকে কিছুটা তফাতে একটা জায়গা বেছে নিয়ে তারা দুজন বসল। রুস্তম সিগারেট ধরাল। নানা ধরনের কথাবার্তা চলতে থাকল দুজনের মধ্যে।

বেশ অনেকটা সময় গল্প করতে করতে কেটে গেল। সূর্য প্রায় মাথার উপর। একসময় গরম লাগতে শুরু করল দেখে পুলক বলল, 'চলো রিসর্টে ফেরা যাক।'

উঠে দাঁড়াল তারা দুজন। আর সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা তফাতে কর্কশ ভাবে একদল কাক ডাকতে শুরু করল। মৃদু চমকে উঠে সেদিকে তাকাতেই একটা দৃশ্য চোখে পড়ল তাদের। কিছুটা তফাতে একটা ঝোপের আড়ালে একখণ্ড ফাঁকা জমি ঢালু হয়ে নদীতে নেমে গিয়েছে। সেখানে কোমর জলে দাঁড়িয়ে স্নান করছে একজন যুবতী মেয়ে। আর পাড়টাতে তার সামনে রয়েছে চারটে দাঁড়কাক। মাঝে ঝোপের আড়াল থাকায় কেউ কাউকে খেয়াল করেনি। এখন পুলকরা উঠে দাঁড়াতেই তাদের দেখতে পেয়ে সম্ভবত চিৎকার করছে কাকগুলো। হ্যাঁ, তাদের দিকে তাকিয়েই চিৎকার করছে কাকগুলো।

আর এরপর সেই স্নানরত যুবতীও ফিরে তাকাল পুলকদের দিকে। বেশ অস্বস্তি বোধ করল পুলক। কে জানে যুবতী হয়তো ভাবছে যে তারা এই আড়াল থেকে এতক্ষণ তার স্নান দেখছিল। তাদের

দেখার পরই দু'হাতে জল সরাতে সরাতে পাড়ে উঠে দাঁড়াল সেই মেয়েটা। পরনে একটাই শাড়ি তার। জলে ভিজে সাদা রঙের শাড়িটা একদম লেপ্টে গেছে মেয়েটার শরীরের সঙ্গে। পূর্ণ যৌবনার দেহের প্রতিটা অঙ্গ, বিভাজিকা-খাঁজ প্রকট হয়ে উঠেছে সূর্যের আলোতে।

মেয়েটা পাড়ে উঠে আরও একবার ভালো করে তাকাল দুই যুবকের দিকে। কোনও লজ্জাবোধ নয়। আবছা একটা হাসি যেন ফুটে উঠল মেয়েটার ঠোঁটের কোণে। নদী-তট থেকে ধীর পায়ে সে এগোল জঙ্গলের দিকে। আর কাকগুলোও মাটির উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মেয়েটাকে অনুসরণ করে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

রুস্তম মন্তব্য করল, 'সাধুবাবার কাক বলে মনে হচ্ছে! মেয়েটাও ওখানে থাকে নাকি?' নদীর পাড় ছেড়ে এরপর তারাও ফেরার পথ ধরল।

গাছের রাজ্যের ভিতরে ঢুকে কিছুটা এগিয়েই তারা আবার দেখতে পেল সেই মেয়েটাকে। যে পথ ধরে তারা এগোচ্ছে সে পথ ধরেই তাদের কিছুটা আগে আগে চলেছে মেয়েটা। উন্মুক্ত পিঠে মাথার চুল থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। ভেজা শাড়ি লেপ্টে আছে তার ছন্দোবদ্ধ শরীরে। আর কাকগুলোও একইভাবে লাফাতে লাফাতে তার পিছন পিছন চলেছে।

মেয়েটার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে তারা একসময় সাধুর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। যুবতীই আগে তার দাঁড়কাকের দল নিয়ে প্রবেশ করল ফাঁকা জমিটাতে এবার আর একজনকে দেখতে পেল ওরা। জটাজুটধারী একটা লোক। পরনে রক্তাম্বর—লুঙ্গির মতো করে পরা। উন্মুক্ত বক্ষ, আর বাহুরে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। কাকবাবা!

মেয়েটা তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতেই সাধু তার উদ্দেশে হেসে বলে উঠলেন, 'কাকগুলো কিছুতেই তোকে ছাড়বে না দেখছি!'

এ কথার জবাবে মেয়েটা কী যেন একটা বলল তা ঠিক শুনতে পেল না তারা দুজন। আর এরপর তারা গাছের আড়াল থেকে প্রবেশ করল ফাঁকা জমিটার মধ্যে।

সাধুও এবার দেখতে পেয়ে গেলেন দুজনকে। তাদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কারা?' মেয়েটাও এবার ফিরে তাকাল তাদের দিকে।

পুলকরা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কাকবাবার সামনে। তার কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। রুস্তম জবাব দিল, 'আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।'

সাধুবাবা আবার প্রশ্ন করলেন, 'কলকাতা থেকে?'

মেয়েটার দিকে চোখ রেখেই রুস্তম জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে?'

রুস্তমের চোখের দৃষ্টি দেখে সাধুবাবা এবার বুঝতে পারলেন মেয়েটার ভেজা শরীরটাকে দেখছে সে। সাধু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা তুই ঘরে ঢোক।'

মেয়েটা তার কথা শুনে চপলভাবে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'ঘরে যাব কেন? গায়ের কাপড়টা আগে শুকিয়ে নিই।'

তার জবাব শুনে সাধুবাবা এরপর ধমকের স্বরেই বললেন, 'তোকে ঘরে যেতে বলছি ঘরে যা। কথা বাড়াস না।'

এবার তার কথা শুনে মেয়েটা তার উদ্দেশে কপট রাগ দেখিয়ে প্রথমে বলল, 'এখানে থাকলে কী হতো? তোমার খালি সন্দেহ। ঠিক আছে যাচ্ছি, কিন্তু একটু পর আবার আমাকে নদীর পাড়ে জল আনতে যেতে হবে।'

—এই বলে মেয়েটা স্পষ্টই রুস্তম আর পুলকের উদ্দেশে একটা চোখের ইশারা ছুড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে সাধুবাবাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল কুঁড়েঘরটার দিকে। দাঁড়কাকগুলোও তার পিছনে লাফাতে লাফাতে এগোল। মেয়েটা ঘরে ঢুকে যেতেই কাক চারটেও লাফিয়ে ঘরের নীচু ছাদের উপর বসল।

মেয়েটা যতক্ষণ না ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল ততক্ষণ তাদের দুজনের মতো সাধুবাবাও চেয়েছিলেন সেদিকে। তারপর পুলকদের দিকে তাকিয়ে মেয়েটাকে দেখে পুলকরা বিস্মিত হয়েছে অনুমান করেই হয়তো বললেন, 'মেয়েটা আমার বামা-স্ত্রী, আমার সাধনাসঙ্গিনী।'

তন্ত্র সাধকদের সাধনাসঙ্গিনী থাকে বলে শুনেছে পুলক। কিন্তু মেয়েটাকে তাঁর বামা-স্ত্রী বলায় একটু অবাকই হল তারা। সাধুর বয়স অন্তত সত্তর হবে, আর মেয়েটার বয়স মেরেকেটে কুড়ি-বাইশ!

কাকবাবা এরপর পুলকদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমাদের কিছু জানার আছে?'

রুস্তম বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। তবে একজনের মুখে শুনলাম এই দাঁড়কাকগুলো নাকি আপনার পোষা?' আপনার কথা শোনে?

মৃদু চুপ করে থেকে কাকবাবা প্রথমে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তবে ওরা আমার থেকে আমার বামারই বেশি অনুগত।'—এ কথা বলার পর তিনি বললেন, 'ঠিক আছে তোমরা এবার যাও।'

রুস্তম আর পুলক এরপর ফেরার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময় সাধুবাবা বলে উঠলেন, 'আর একটা কথা শুনে যাও।' কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রুস্তম বলল, 'কী?'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কাকবাবা বললেন, 'পরস্ত্রীর দিকে নজর দেওয়া কিন্তু পাপ। ক্ষতি হয় তাতে।'

রুস্তম সাধুবাবার কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিল না। সে এগোল ফেরার জন্য। পুলক তাকে অনুসরণ করল। বনপথ ধরে কিছুটা চলার পর রুস্তম মুখ খুলল সে বলল, 'সাধুবাবার কাকশাস্ত্র জানা আছে কিনা জানি না, তবে মনে হয় কোকশাস্ত্রটা ভালোই জানা আছে। নইলে বুড়ো বয়সে অমন যুবতী মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে পারে! তবে ব্যাপারটাতে ভয়ও আছে তার। নারীদের মতিগতি সাধুরাও বুঝতে পারে না। সে জন্যই ফেরার সময় ওই সাবধান বাণীটা শোনাল।'

পুলক হাসল রুস্তমের কথা শুনে।

একসময় জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে এল তারা। বেশ কিছুটা দূরে তাদের রিসর্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রিসর্টের দিকে কিছুটা এগোবার পরই হঠাৎ রুস্তম থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি রিসর্টে ফিরে যাও।

আমি একটা কাজ সেরে আসি।'

পুলক জানতে চাইল, 'কোথায় যাবে?'

রুস্তম জবাব দিল, 'দেখি কাজটা করতে পারি কিনা। পারলে ফিরে এসে তোমাকে বলব।'

অগত্যা পুলক একাই রওনা দিল রিসর্টের দিকে।

৩

রিসর্টে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে বেলা দুটো নাগাদ বিছানায় শুয়ে পড়েছিল পুলক। রুস্তম তখনও ফেরেনি। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ম্যানেজারের ডাকে ঘুম ভাঙল। তার চা নিয়ে এসেছে সে। পুলক তার কাছে জানতে চাইল;'রুস্তমবাবু ফিরেছেন?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, বেলা তিনটে নগাদ ফিরেছেন। খাওয়া সেরে ঘরে ঢোকার সময় বলেছেন, রাতে খাবার দেবার আগে যেন তাকে ডাকা না হয়। গতরাতে ঘুমানো হয়নি তার। গাড়ি চালিয়ে এসেছেন, তাই লম্বা ঘুম দেবেন।'

বাইরে যাবার তেমন কোনও দরকার নেই। তাই সন্ধ্যা থেকে রাত পুরো সময়টা তার নিজের ঘরেই কাটিয়ে দিল পুলক। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ম্যানেজার আবার এল রাতের খাবার নিয়ে। পুলক তাকে আবার প্রশ্ন করল, 'আপনার অন্য গেস্টের ঘুম ভাঙল?'

ম্যানেজার জবাব দিল, 'জানি না স্যার। তার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আপনাকে খাবার দিতে এলাম। এবার তার ঘরে যাব।'

এ কথা বলার পর লোকটা বলল, 'আজ রাতে আমি রিসর্টে থাকব না স্যার। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রাতে বাড়ি থাকতে হবে। সকাল ছ'টার মধ্যেই আমি আবার রিসর্টে চলে আসব।'

পুলক জানতে চাইল, 'তাতে আমাদের কোনও অসুবিধা হবে না তো?'

লোকটা বলল, 'না, এখানে চোর-ডাকাত ছিনতাইবাজদের কোনও উপদ্রব নেই। তবে...'

'তবে কী?' জানাতে চাইল পুলক।

তার প্রশ্ন শুনে লোকটা একটু ইতস্তত করে বলল, 'রাতে রিসর্ট ছেড়ে ওই জঙ্গলের দিকটাতে যাবেন না। আপনারা শহরের লোক, জানি অনেক ব্যাপারে আপনাদের বিশ্বাস নেই। তবে রাতে কাকসাধুর ডেরায় যাবেন না। ওখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। রাতে জায়গাটা ভালো নয়।'

পুলক লোকটার কথা শুনে হাসল। খাবার রেখে চলে গেল লোকটা।

আরও ঘণ্টাখানেক পর রাতের খাবার খেল পুলক। খেতে খেতেই পুলক শুনতে পেল ম্যানেজারের মোটর সাইকেলের শব্দ রিসর্ট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া সেরে শোবার আগে একটু পায়চারি করার পর পুলকের মনে হল রুস্তম তো আর ফিরে এসে দেখা করল না। একবার তার সঙ্গে দেখা করা দরকার; এ কথা ভেবে পুলক তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘরের বাইরে বেরতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় রুস্তম নিজেই তার ঘরে এসে ঢুকল।

পুলকের উদ্দেশে সে হেসে বলল, 'আজকের রাতটা জাগতে হবে, তাই সারা দিন ঘুমিয়ে নিলাম। শেষ পর্যন্ত যে কাজে গিয়েছিলাম সে কাজটা হয়েছে।' পুলক জানতে চাইল, 'কী কাজ?'

রুস্তম হেসে বলল, 'মেয়েটাকে রাজি করিয়ে ফেলেছি। মানে, কাকবাবার বামাকে। সাধু রাতে কুঁড়েতে থাকে না। আজ রাতে তাঁর বামার সঙ্গে ওই কুঁড়ে ঘরে রাত কাটাব আমি।'

তার কথা শুনে পুলক আবার বলল, 'কীভাবে তাকে রাজি করালে?'

রুস্তম বলল, 'তোমাকে রিসর্টে পাঠিয়ে গাছের আড়াল দিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম। মেয়েটা জল নিতে আসতেই তাকে গিয়ে ধরলাম। রাজি হল মেয়েটা। তবে বেরোবার সময় আমি ভুল করে মানিব্যাগটা ঘরে ফেলে গিয়েছিলাম, কাজেই তাকে রাজি করাবার জন্য গলা থেকে হারটা খুলে দিলাম। যদিও ওর দাম অনেক। কিন্তু কী আর করা যাবে। আজকের রাতটাও তো দামি!'

পুলক বিস্মিতভাবে বলল, 'তুমি তবে সত্যি সেখানে যাবে?'

রুস্তম বলল, 'হ্যাঁ। তাই তোমাকে জানাতে এলাম। কাল ভোরের আগেই ফিরে আসব। গুডনাইট।' এই বলে পুলককে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রুস্তম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এত বিস্ময়কর লাগল পুলকের কাছে, যে বেশ কিছুক্ষণ পুলক বুঝতে পারল না রুস্তম যা করতে চলেছে তাতে তার বাধা দেওয়া উচিত কিনা? যদিও সে রুস্তমকে বাধা দেওয়ার কেউ নয়, তবুও পুলকের একসময় মনে হল, রুস্তমকে একবার তার নিষেধ করা উচিত ছিল। হয়তো রুস্তম শুনত তার কথা। সে যা করতে চলেছে তা ঠিক নয়। আর এরপরই তার মনে পড়ে গেল ম্যানেজারের বলে যাওয়া কথাগুলো। যদিও পুলক ভূত-প্রেত-অপদেবতা বিশ্বাস করে না, তবু অন্য কোনও বিপদও তো ঘটতে পারে। সাপখোপও তো কামড়াতে পারে। একা চলে গেল ছেলেটা! তার ওপর ছেলেটা স্বাভাবিকভাবে হাঁটচলা করতে পারে না, ব্যাপারটা নিয়ে একটা অস্থিরতা কাজ করতে লাগল পুলকের মনে।

ঘড়ি দেখল পুলক। রুস্তম চলে যাবার পর পনেরো-কুড়ি মিনিট সময় কেটেছে। এখনও হয়তো বেরোলে কুঁড়েতে পৌঁছবার আগে তাকে ধরে ফেলা যেতে পারে। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না তাকে থামানো যায় কিনা? এ কথাটা মনে করে একটু দোনামোনা ভাবেই শেষ পর্যন্ত ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোল পুলক। প্রথমে রিসর্টের লনে, তারপর কম্পাউন্ড ত্যাগ করে রিসর্টের বাইরে বেরোল।

আকাশে গোল চাঁদ উঠেছে। ধুলো-দূষণহীন জায়গা বলে চাঁদটাকে বেশ বড় দেখাচ্ছে। তার আলো ফটফট করছে চারপাশে। একেই সম্ভবত 'কাক জ্যোৎস্না' বলে। চারপাশে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুলক দ্রুত এগোল জঙ্গলের দিকে। অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করার পর পুলক যেন দেখতে পেল একটা লোক প্রবেশ করল সেই জঙ্গলের মধ্যে। নিশ্চয়ই রুস্তম হবে। পুলক তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল। একসময় সে পৌঁছে গেল জঙ্গলে প্রবেশ করার সেই পথের মুখটাতে।

জায়গাটাতে পৌঁছে জঙ্গলে ঢোকার আগে একবার মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পুলক ভাবল ভিতরে ঢোকা কি তার ঠিক হবে? কিন্তু এর পরক্ষণেই তার মনে হল, কী আর হবে? রুস্তম যদি

সাহস করে রাতে জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে পারে, সে তবে পারবে না কেন? পুলক ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে।

জঙ্গলের ভিতর জমে আছে চাপচাপ অন্ধকার। মাঝে মাঝে শুধু গাছের মাথার উপরে ডালপালার ফাঁক গলে চাঁদের আলো প্রবেশ করছে। সেই আলোতে কিছুটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই এগোতে লাগল পুলক। অবশেষে এক সময় সে পৌঁছে গেল সেই ফাঁকা জমিতে।

মাথার উপরে গাছের ডালপালার চাঁদোয়া না থাকায় এ জায়গাটাতে চাঁদের আলো ফটফট করছে। বরং বলা যেতে পারে আকাশ থেকে জ্যোৎস্না যেন চুঁইয়ে নেমে এসেছে এই ছোট্ট ফাঁকা জমিটাতে। হয়তো চারপাশ থেকে অন্ধকার জঙ্গল জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে বলেই ফাঁকা জমিটা বেশি আলোকিত মনে হচ্ছে।

সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাকবাবার পঞ্চমুণ্ডির আসন, তার কুঁড়ে, এমনকী কুঁড়ে ঘরের দরজার মাথার উপরের চালের উপর বসে থাকা দাঁড়কাকগুলোকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু চারদিক তাকিয়ে রুস্তমকে কোথাও দেখতে পেল না সে। পুলক ভালো করে তাকাল ঘরটার দিকে। দরজার পাল্লাটা খোলা। রুস্তম কি তবে ঘরে ঢুকে পড়েছে? তাহলে তো আর এখন পুলকের কিছু করার নেই। তাকে এবার ফেরার পথ ধরতে হবে।

কিন্তু এ কথা ভেবেও ফিরতে পারল না পুলক। চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা কুঁড়েঘরের খোলা দরজাটা কেমন যেন আকর্ষণ করতে লাগল তাকে। কোনও গোপন জৈবিক দৃশ্যের আকর্ষণ, না অন্য কিছুর আকর্ষণ তা পুলক বুঝতে পারল না। তার মনে হতে লাগল খোলা দরজাটা যেন তাকে ডাকছে! ফেরার পথ না ধরে কিছুটা সম্মোহিতের মতোই সে ধীর পায়ে এগোতে লাগল কুঁড়ে ঘরটার দিকে।

ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল পুলক। দরজার ঠিক মাথার উপরই সার বেঁধে চারটে দাঁড়কাক বসে আছে। ঠিক যেন পাথর বা মাটির তৈরি মূর্তি তারা। একদম নড়ছে না। তাদের কালো পালক আর ঠোঁটগুলো চকচক করছে জ্যোৎস্নায়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর অস্পষ্ট খসখস শব্দ শুনতে পেল পুলক। এক অদ্ভুত অজানা আকর্ষণ পুলককে যেন বাধ্য করল ঘরের ভিতর উঁকি দিতে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে ঘরের ভেতরে তাকাল সে। উল্টোদিকের একটা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো প্রবেশ করছে ঘরে। সেই আলোতে পুলক দেখতে পেল ঘরের মধ্যে খড়ের বিছানার উপর মিলনরত তাদের দুজনকে। সে দৃশ্যের দিকে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে সম্বিত ফিরল পুলকের। না, এ দৃশ্য দেখা উচিত হচ্ছে না। দরজার পাশ থেকে সরে আসতে গেল পুলক। ঠিক সেই সময় যেন হাত লেগে দরজার পাল্লাটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে উঠল। আর সেই শব্দ শুনেই যেন মিলনরত অবস্থায় দরজার দিকে মুখ ফেরাল সেই নারী। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখে।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হিম হয়ে গেল পুলকের শরীর। এ কী দৃশ্য দেখছে সে! আর এর পরমূহূর্তেই ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল রুস্তমও। সে যেন চেষ্টা করল বিছানা থেকে নামার জন্য, কিন্তু পারল না। নারী আলিঙ্গন করে রেখেছে তাকে। আর তার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই মাথার উপর চালে

বসা কাকগুলো রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিকট স্বরে ডাকতে শুরু করল! কেমন যেন এক কর্কশ উল্লাসধ্বনি তাদের ডাকে। যেন এমন কোনও মুহূর্তের অপেক্ষায় এতক্ষণ নিশ্চুপভাবে অপেক্ষা করছিল তারা!

মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি হল কুঁড়ে ঘরের বাইরে-ভিতরে। পুলক কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দরজাটা ছেড়ে ছুটতে শুরু করল। তার পিছনে ঘরের ভিতরে থেকে ভেসে আসতে লাগল বামার কণ্ঠের খিলখিল হাসি আর চালের উপর থেকে দাঁড়কাকগুলোর উল্লাসধ্বনি।

৪

ঘরে ফিরে বাকি রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিল পুলক। মাঝে-মাঝেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল কাকসাধুর ঘরের ভিতর দেখা সেই দৃশ্যটা! সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে হিম হয়ে যাচ্ছিল তার শরীর। একসময় ভোরের আলো ফুটতে শুরু করল। আলো অনেক সময় ভয়কে মুছে ফেলে। ধীরে ধীরে ধাতস্থ হতে শুরু করল পুলক।

বেলা আটটা নাগাদ চা আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকল ম্যানেজার। সে হেসে প্রশ্ন করল, 'রাতে কোনও অসুবিধা হয়নি তো স্যার?'

গত রাতের ঘটনাটা তাকে জানানো সমীচীন মনে করল না পুলক। হয়তো সে যা দেখেছে সেটা তার মনের ভুল? আবার ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে, রুস্তমের সত্যি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তবে গতকাল রাতের ঘটনা ম্যানেজারকে জানালে সেও কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারে। তাই সে শুধু ম্যানেজারকে প্রশ্ন করল, 'রুস্তমবাবু ঘুম থেকে উঠেছেন?'

ম্যানেজার জবাব দিল, 'তার ঘরের দরজা বন্ধ দেখলাম। মনে হয় তিনি মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছেন অথবা নদীর তীরে বেড়াতে গিয়েছেন।'

তার কথা শুনে পুলক বুঝতে পারল যে গতকালের ঘটনা সম্বন্ধে ম্যানেজারের কিছুই জানা নেই। নিশ্চিন্ত বোধ করল সে। আজই পুলকের কলকাতায় ফেরার কথা। তাই এরপর সে ম্যানেজারকে বলল, 'বিল রেডি করে রাখবেন। দশটার সময় আমি রুম ছেড়ে দেব।'

'আচ্ছা স্যার।' বলে ম্যানেজার চলে গেল।

বাইরে ঝলমল করতে শুরু করেছে দিনের আলো। আর সেই আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার মনের সব আতঙ্ক উবে গেল। পুলকের মনে হতে লাগল সে যা দেখেছে সব মিথ্যা। তা কখনওই হতে পারে না। সম্ভবত তা আলো-ছায়ার কারসাজি। পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক সময় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। এক্ষেত্রেও তেমনই কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই। তবুও তার মনটা কেমন যেন খচ খচ করতে লাগল। একসময় সে সিদ্ধান্ত নিল যে কলকাতায় রওনা হবার আগে একবার কাকবাবার ওখানে যাবে সে। দিনের আলোতে তো আর তার ভয়ের কোনও কারণ নেই। সন্দেহ নিরসন করতে

হবে তাকে। বলা যায় না রুস্তমের সঙ্গে হয়তো দেখাও হয়ে যেতে পারে তার। হয়তো ওদিকেই কোথাও আছে সে। সুস্থ অবস্থাতেই আছে। বামার আকর্ষণ ওখানেই আটকে রেখেছে তাকে।

স্নান সেরে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে ঠিক বেলা দশটার সময় ঘর ছাড়ল পুলক। রিসেপশনে গিয়ে রিসর্টের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে সে ম্যানেজারকে প্রশ্ন করল, 'তিনি ফিরেছেন?' ম্যানেজার জবাব দিল, 'না ফেরেননি। মনে হয় তিনি নদীর দিকে গিয়েছেন। এ সময়টা নদীর পাড় খুব সুন্দর লাগে।'

তার কথার জবাবে পুলক বলল, 'তিনি ফিরলে বলবেন আমি কলকাতায় রওনা হয়ে গিয়েছি।'

লনের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে পুলকের গাড়িটা। আর তার পাশে রুস্তমের গাড়িটাও। পুলক এসে উঠে বসল তার নিজের গাড়িতে। তারপর গাড়ি স্টার্ট করে রিসর্টের বাইরে বেরিয়ে এল। চারপাশে ঝলমল করছে রোদ্দুর। কোথাও কোনও মলিনতার চিহ্ন নেই। গাড়িটা নিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল বনে ঢোকার শুঁড়ি পথের মুখটাতে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে প্রবেশ করল জঙ্গলের ভিতর।

জঙ্গল আজও একই রকম থমথমে। কিন্তু উত্তেজনা কাজ করলেও কোনও অপদেবতার ভয় কাজ করল না পুলকের মনে। হয়তো বা দিনের আলোক মাহাত্ম্যের জন্যই। তার মনে হতে লাগল গত রাতে সে যা দেখেছে সেটা নিছকই তার দৃষ্টিবিভ্রম। গাছের দঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে একসময় সে উপস্থিত হল সেই ফাঁকা জমিটাতে।

মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ। সূর্যের আলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। কোথাও কোনও অন্ধকারের লেশমাত্র নেই। সাধুবাবার কুঁড়েটাও প্রকট আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে কাকবাবা, তাঁর বামা কিংবা রুস্তম; কাউকেই দেখতে পেল না পুলক। তবে কাকবাবার কাকগুলোকে দেখতে পেল। ফাঁকা জমির একপাশে রোদের মধ্যে জটলা করছে তারা।

কাক চারটেকে দেখে মনে মনে হেসে ফেলল পুলক। গতকাল রাতে এই কাকগুলোর চিৎকারও পরিবেশটাকে আরও ভৌতিক করে তুলেছিল। নিশ্চয়ই পুলককে দেখে ভয় পেয়েই অমন চিৎকার করেছিল তারা। আর তাতে আরও বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিল পুলক। কুঁড়ে ঘরের দরজাটা আগের মতোই খোলা। সাধুবাবা বা তাঁর বামা কি ওই ঘরের মধ্যেই আছেন? বিশেষত, সেই যুবতীকে যদি পুলক দেখতে পায় তবে সে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হবে যে গত রাতে তার দেখা ভুল ছিল। কথাটা মনে করে কুঁড়ের দিকে এগোল সে।

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সটান ঘরের ভিতর উঁকি দিল পুলক। দরজা জানলা দিয়ে ঢোকা বাইরের সূর্যালোকে ঘরের ভিতরটা আলোকিত। না, কাকবাবা, তাঁর বামা বা রুস্তম কেউই ঘরে নেই। তবে সেই কঙ্কালটাকে দেখতে পেল পুলক। সেটা অবশ্য গতকালের সকালের মতো ঘরের কোণে রাখা নেই। লালপাড় সাদা শাড়ি জড়ানো কঙ্কালটা বেড়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে খড়ের বিছানার উপর বসানো আছে। ভালো করে তার দিকে তাকাতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করল পুলক। কঙ্কালটার গলা থেকে ঝুলছে একটা সোনার হার! রুস্তমের গলার সোনার হারটা। সেটা দেখে পুলক মৃদু বিস্মিত হলেও মনকে এই বলে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল যে সেই বামা নিশ্চয়ই তার

গলার হারটা কঙ্কালের গলায় পরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। এবার পুলককে ফিরতে হবে। কাউকেই কোথাও দেখতে পাচ্ছে না সে।

কিন্তু দরজা ছেড়ে কয়েক পা এগোতেই পুলক দেখতে পেল, নদীর দিকের একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন সাধুবাবা। ফাঁকা জমিটার মাঝখানে মুখোমুখি হল তারা দুজন। সাধুবাবা তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

পুলক একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, 'গতকাল আমার সঙ্গে এখানে যে এসেছিল সে এখানে আছে কিনা দেখতে।'

তার কথা শুনে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কাকসাধু। তারপর যেন মৃদু আপশোসের স্বরে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গীকে সাবধান করেছিলাম। কিন্তু সে শুনল না। আমি রাতে নদীর ধারে থাকি। এখানে যা ঘটার ঘটল। আমি তার কামনা মেটাতে পারি না। আমার অবর্তমানে সে তার কামনা মেটাল।'

তার কথা শুনে পুলক বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, 'কী ঘটল?'

সাধুবাবা তার প্রশ্নের উত্তরে মুখে কিছু না বলে কিছুটা তফাতে মাটির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। তার অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল পুলক। সেখানে মাটির উপর একটি দাঁড়কাক বসে তাকিয়ে আছে পুলকের দিকে।

সেদিকে তাকিয়ে এরপর কাকবাবা স্পষ্টই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার কিছু করার নেই। প্রেত-সঙ্গম করে প্রেতযোনী প্রাপ্ত হলে মানুষ দাঁড়কাকে পরিণত হয়। কাকের সংখ্যা আরও একটা বাড়ল। চার থেকে পাঁচ হল! আসলে দাঁড়কাকগুলো আমার নয়, বামার। ও আমার বামা বলে কাকগুলো আমারও কথা শোনে।'

সাধুবাবার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার কুঁড়ের দিকে একটা শব্দ হল। পুলক সেদিকে তাকিয়ে দেখল ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল বামা। তার পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি। গলায় সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে সোনার হার! তাকে দেখে চমকে উঠল পুলক। এই মাত্র তো ঘরটা দেখে এল সে! ঘরে তো সেই কঙ্কালটা ছাড়া আর কেউ ছিল না! তার পরনেও ছিল একই শাড়ি, একই রকম সোনার হার!

লাস্যময়ী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পুলক আর সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে একবার সেই নারী আমোদে খিলখিল করে হাসল। তাকে দেখে চারটে কাক ডানা ঝাপটে উঠল। তাদের দিকে তাকিয়ে বামা প্রথমে বলল, 'আয় আয়। নদীতে স্নানে যাব। আমাকে দেখবি না?'

এই বলে সে এগোল নদীর দিকে যাওয়ার জন্য। কিন্তু একটু এগিয়েই সে পিছু ফিরে দাঁড়াল। পুলকের কিছুটা তফাতে পঞ্চম কাকটা তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার উদ্দেশে বামা হেসে বলল, 'আয় আয়, তুইও আয়। খোঁড়া বলে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?' অন্য চারটে কাক তখন পৌঁছে গিয়েছে তার কাছে।

তার কথা শুনে পুলকের দিকে তাকিয়ে শেষ একটা শব্দ করল কাকটা। হয়তো সে পুলকের উদ্দেশে বলল, 'চললাম।'

তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাফাতে লাফাতে এগোল সেই নারীর ডাকে।

মুহূর্তের জন্য পুলকের চোখে ফুটে উঠল গতরাতের সেই দৃশ্য। রুস্তমকে আলিঙ্গন করে আছে এক নরকঙ্কাল! সাধুবাবার বামা!

পাঁচটা কাককে নিয়ে বামা অদৃশ্য হয়ে গেল নদীর দিকে গাছের আড়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গেই পুলকও পা বাড়াল দ্রুত সে জায়গা ত্যাগ করার জন্য। কে বলতে পারে সাধুবাবার বামা তাকেই নদীর পাড়ে টেনে নিয়ে যাবে না দাঁড়কাকের সংখ্যা একটা বাড়াবার জন্য? এখনই এ জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে তাকে।

ফেরা

একে রবিবার, তার ওপর আবার কর্ড লাইনের ট্রেনের লেডিজ কম্পার্টমেন্ট। কাজেই বসতে অসুবিধা হয়নি আমার। এই সত্তর কিলোমিটার যাত্রাপথে মাত্র কয়েকজন যাত্রী ওঠানামা করেছে। জানলার ধারের সিটে বসে চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে এ লাইনে প্রথম দিনের ট্রেন যাত্রার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেদিন বুকের মধ্যে একটা ধুকপুকানি কাজ করছিল।

সেই আমার প্রথম এ লাইনে আসা। সত্যি কথা বলতে কী তার আগে একলা খুব একটা ট্রেনেও চাপিনি আমি। দু-চার বার ট্রেনে চেপে যখন আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গেছি তখন সঙ্গে মা থাকত। তাই প্রথম দিন একলা ট্রেনে চাপার পর উত্তেজনা কাজ করাটাই স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া একদম নতুন জায়গাতে একদম নতুন পরিবেশে যেতে হচ্ছে, তার জন্য মনের মধ্যে একটা চাপ তো ছিলই। তবে সেদিন আজকের মতো ফাঁকা ছিল না কম্পার্টমেন্ট। যথেষ্ট ভিড় ছিল। কোনো মতে বসার জায়গা পেয়েছিলাম আমি। তারপর অবশ্য রোজ আসা-যাওয়া করতে করতে ধীরে ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছিল।

তিনমাস আগে পর্যন্ত এক বছর ধরে এ পথে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেছি আমি। তবে আজ ট্রেনে চাপার পর অন্য একটা মৃদু শঙ্কা কাজ করছিল। টানা একবছর এই কম্পার্টমেন্টে যাওয়া আসার সুবাদে কিছু নিত্যযাত্রীর সঙ্গে আমার পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। তাদের কারো সঙ্গে যদি আজ দেখা হয়ে যায়? যদি তারা আমাকে জিগ্যেস করে গত তিনমাস আমার দেখা নেই কেন, তখন কী জবাব দেব তাদের?—এই শঙ্কাটাই কাজ করছিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে তেমন কারো সঙ্গে দেখা হল না আমার।

আজ দশটা নাগাদ ট্রেনে চেপেছিলাম। যেখানে যাচ্ছিলাম সেটা ঘণ্টা দুইয়ের দূরত্ব আমার বাড়ি থেকে। জানলার বাইরে তাকিয়ে পুরোনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে খেয়াল করছিলাম সূর্যের তেজ ক্রমশ কমে আসছে। বর্ষাকাল, এমন হওয়াটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়! যে স্টেশনে নামব তার দু-তিনটে স্টেশন আগেই আকাশ কালো হয়ে এল। তারপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নামল। গন্তব্যে যখন পৌঁছলাম তখন আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে! ছাতাটা খুলে প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে নেমে কোনো রকমে ছুটে একটা গুমটির নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য। দিনের বেলাতেই চারপাশে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে।

ছোট্ট প্ল্যাটফর্মটাতে কোথাও কোনো লোকজন নেই। এমনিতেই এই ছোট্ট হল্ট স্টেশনে তেমন আনাগোনা ছিল না লোকজনের। তবে বছর তিনেক ধরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজটা চালু হবার পর থেকে ছাত্রছাত্রী আর কিছু লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আমিও এখানে কোনোদিন আসতাম না যদি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে র‍্যাঙ্কটা ভালো করতে পারতাম। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে চান্স পেলাম না, অগত্যা এখানে আসতে হল। আমি অবশ্য মাকে প্রথমে বলেছিলাম যে আর একটা বছর পরীক্ষা দিই। দেখি যদি ভালো র‍্যাঙ্ক করে কাছাকাছি কোনো সরকারি হাসপাতালে চান্স পাই?

মা শুনে বলেছিলেন, 'না, বছর নষ্ট করার দরকার নেই। তোর বাবা চাকরি করতে করতে মারা যাবার পর ডেথ বেনিফিট হিসাবে যে টাকা পেয়েছিলাম, তা তো ব্যাঙ্কেই রাখা আছে। আমার তো

আর ছেলেমেয়ে নেই যে তার পিছনেও টাকা খরচ করতে হবে। ওই টাকা দিয়ে তুই ভর্তি হয়ে যা। তাছাড়া আমার যা হার্টের অবস্থা তাতে কবে কী হয় আমার।'

প্রবল বর্ষণসিক্ত প্ল্যাটফর্মের গুমটির নীচে দাঁড়িয়ে মা'র কথা মনে পড়ে গেল আমার। কত আশা নিয়ে মা আমাকে এখানকার মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছিল। কিন্তু মা'র শেষ কথাগুলো যে এত দ্রুত ফলে যাবে আমি ভাবিনি। আমি কলেজে ভর্তি হবার তিন মাসের মাথায় এমনই এক বৃষ্টির দিনে, আমাকে কাঁদিয়ে, একলা ফেলে রেখে মা চলে গেল। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক।

মা'র কথা মনে পড়তেই ঝোড়ো বাতাসের মতোই প্রথমে মনটা হুহু করে উঠল আমার। তার পরক্ষণেই আমার মনে হল, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। আজ যদি মা বেঁচে থাকত তবে...

বৃষ্টি থামার কোনো বিরাম নেই। অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি। আরও একটা কথা মনে হতে লাগল আমার। যদিও প্রফেসর মজুমদার ছুটির দিনও বেশির ভাগ সময় কলেজেই কাটান ম্যানেজমেন্টের অংশ বলে। কিন্তু তিনি যদি কোয়ার্টারে ফিরে যান তবে সমস্যা হতে পারে। হয়তো তার সঙ্গে একলা সাক্ষাতের সুযোগ হল না। তখন তো এখানে আসাটাই মাটি হবে। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই তো আমার এখানে আসা। এ ব্যাপারটা কিছুক্ষণ আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাবার পরই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কলেজের দিকে রওনা হব। বৃষ্টিতে ভিজলে কীই বা হবে আমার? প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে আমি ছাতা মাথায় রেল লাইন বরাবর হাঁটতে লাগলাম। এটাই কলেজ পৌঁছবার শর্টকাট রাস্তা। শহরের বাইরে রেললাইনের পাশে গড়ে উঠেছে ওই প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ।

২

বিশাল কম্পাউন্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলেজটা। দু-পাশে ধানী জমি। শহরের তুলনায় এখানকার জমির দাম সস্তা ও অনেক জমি পাওয়া যাবে বলে ব্যবসায়িক বুদ্ধি খাটিয়ে এখানেই নির্মাণ করা হয়েছে কলেজটা। পাশে একটা হস্টেল নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। যদিও সেটা এখনও অসম্পূর্ণ। রেললাইন ধরে এসে আমি পৌঁছে গেলাম কলেজের পিছনের গেটে। কলেজের মেন গেটে এসে থেমেছে বাসরাস্তা। যারা শহর থেকে বাসে করে আসে তারা মেন গেট দিয়ে কলেজে ঢোকে। আর আমরা যারা ট্রেনে আসি তারা লাইন ধরে হেঁটে এসে পিছনের গেট দিয়ে কলেজে ঢুকি। সামনের গেট দিয়ে ঢুকলে বেশ কিছুটা ঘুরে আসতে হয়।

ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলাম আমি। বৃষ্টি যেন আরও বাড়ছে। ছাতা থাকলেও বৃষ্টির ছাট শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। ক্যাম্পাসের ভিতর কেউ কোথাও নেই। এখানে কোনো ছাত্রাবাস না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা হয় নিজেদের বাড়ির থেকে কলেজে যাওয়া-আসা করে অথবা শহরের দিকে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। অধিকাংশ প্রফেসর-ডাক্তাররাও তাই করেন। শুধু ডাক্তার মজুমদারের মতো কয়েকজন কলেজেরই অন্য একটা অংশে কোয়ার্টারে থাকেন।

সিকিওরিটির লোকজনের কাউকেও দেখতে পেলাম না আমি। হয়তো তারা এই বৃষ্টিতে পানীয়তে অথবা তাসের আড্ডায় মগ্ন। অ্যাডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিং, ক্লাসরুম সবই একই ছাদের তলায়। পিছনের

লনটা অতিক্রম করে আমি বিল্ডিং-এ প্রবেশ করলাম। ছাতাটা বন্ধ করে এগোলাম আমি। লম্বা অলিন্দ এঁকেবেঁকে চলে গেছে সামনের দিকে। দু-পাশে তালা বন্ধ সার সার ক্লাসরুম, অফিস ঘর, কমনরুম ইত্যাদি। আজ সব তালা বন্ধ। দিনে এ অলিন্দ মুখরিত থাকে ছাত্রছাত্রীদের কথাবার্তায়, ঘরগুলো থেকে ভেসে আসা অধ্যাপকদের ক্লাস নেবার শব্দে। কিন্তু আজ সব নিস্তব্ধ। নিজের পায়ের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি আমি।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেই ঘরটার সামনে পৌঁছে গেলাম। হ্যাঁ, এটাই প্রফেসর মজুমদারের ঘর। বাইরে পিতলের ফলকে জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম। দরজার পাল্লাটা মৃদু ফাঁক করা। তার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর জ্বলতে থাকা আলোর রেখা বাইরে আসছে। অর্থাৎ তিনি এ ঘরেই আছেন।

ঘরে ঢোকার আগে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম আমি। সেদিন কলেজে সেই ঘটনা ঘটার পর আর আমি কলেজে পা রাখিনি। মনে মনে একবার ভাবার চেষ্টা করলাম আমাকে দেখে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার? পরক্ষণেই মনে হল, আমি ঘাবড়াচ্ছি কেন? আমি তো অপরাধ করিনি, তিনি করেছেন। ভয় পাবার হলে তারই পাবার কথা। তাই দরজা ঠেলে আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম।

বিরাট কাঁচ ঢাকা টেবিলের অপর প্রান্তে বসে সামনে রাখা কী সব কাগজপত্র দেখছিলেন প্রফেসর মজুমদার। তাঁর বয়স বছর পঞ্চান্ন হবে। চোখে সোনার বাই ফোকাল, গৌরবর্ণ সৌম্যকান্তি চেহারা। কিন্তু ওই চেহারার আড়ালেই যে...। না, ওসব কথা এখন থাক। মগ্ন হয়ে কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন তিনি। আমি মৃদু স্বরে তাঁর উদ্দেশে ডাক দিলাম, 'স্যার?'

মুখ তুলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ যেন ভূত দেখার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি প্রবল বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন, 'সংযুক্তা তুমি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, স্যার আমি এসেছি আপনার কাছে।'

বেশ কয়েকমুহূর্ত তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্মিত ভাবে। আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। তারপর সম্ভবত তিনি নিজের উত্তেজনাকে সামলে নিলেন। শুনেছি সার্জারির ডিগ্রির সঙ্গে ম্যানেজমেন্টেরও ডিগ্রি আছে তাঁর। প্রতিকূল পরিস্থিতি কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় তা তিনি জানেন। আমি কলেজে ভর্তি হবার কিছু দিনের মধ্যে ঠিকমতো ক্লাস না হওয়াকে কেন্দ্র করে একটা বিক্ষোভ হয়েছিল। সেটা তিনি সুচারু ভাবে ম্যানেজ করেছিলেন। আর একটা কুড়ি বছরের মেয়েকে ম্যানেজ করতে পারবেন না তিনি? বিশেষত যখন তাঁর অগাধ অর্থ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি।

প্রফেসরের মুখটা অনেকটা যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, 'বসো।' তার মুখোমুখি চেয়ারে আমি বসলাম।

আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে সম্ভবত আমার অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। আমার চোখে যখন তার প্রতি কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ ধরা দিল না তখন তিনি বললেন, 'আমার আগে কিছু বলার আছে তোমাকে। আমার কথা শোনার পর তুমি যা বলার বোলো।'

আমি শান্ত ভাবে জবাব দিলাম, 'আচ্ছা স্যার।'

ডাক্তার মজুমদার বলতে শুরু করলেন, 'যে ঘটনাটা তোমার সঙ্গে ঘটেছে, সেটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। এমন ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রত্যেকের জীবনেই কমবেশি ঘটে। তবে যেহেতু দুর্ঘটনার কারণ আমি, সেহেতু ব্যাপারটা নিয়ে কম্পেনসেট করতে আমি রাজি।'

এই বলে আমার প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য আরও একবার হাসলেন তিনি। আমি চুপ করে রইলাম। তিনি এরপর বললেন, 'হ্যাঁ, যে কথা আমি বলছিলাম। আমি তোমার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করব। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি এই প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত। অংশীদারও বলা যেতে পারে। আমার টাকা লগ্নি করা আছে এই কলেজে। তুমি যদি এ কলেজে পড়তে চাও তবে কোনো সেমিস্টারের জন্য আগামী তিন বছর তোমাকে পয়সা দিতে হবে না। বইপত্র ইত্যাদির জন্য সব খরচও আমার। পড়ার ব্যাপারেও তোমাকে স্পেশাল গাইডেন্সের ব্যবস্থা করব আমি। তাছাড়া পরীক্ষার কোশ্চেন সেট, খাতা দেখার ব্যাপার তো আমার হাতেই থাকে। আমি কী বলছি তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ? এ কলেজ থেকে হায়েস্ট মার্কস নিয়ে ডাক্তারি পাশ করবে তুমি আর তারপরই তোমার সামনে ঝলমলে দিন। আসল জীবন তো তোমার শুরুই হয়নি এখনও। যা ঘটেছে ভুলে যাও। ভাবো ওদিনের ব্যাপারটা নিছকই একটা নাইট শেয়ার।'

আমি চুপ করে রইলাম তাঁর কথা শুনে।

ডাক্তার মজুমদার এরপর আমাকে আরও আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, 'এসব ব্যাপার তো এমনিতেই অনেক সময় হয়। ওই যে তোমার ব্যাচমেট দেবাঙ্গনা বলে মেয়েটা। সে তো আমাকে সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছিল কোনো রিসর্টে তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার জন্য। অনেক সময় জীবনে ছোটখাটো কোনো দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে ভালো ফল দেয়। ব্যাপারটা তোমার ক্ষেত্রেও তাই হবে।'

প্রফেসর মজুমদারের কথা শুনে এবারও কিছু বললাম না আমি। মাথা নীচু করে রইলাম। হয়তো তাই দেখে তিনি ভাবলেন, আমি তাঁর এ প্রস্তাবে রাজি নই। সে জন্য তিনি অন্য প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, 'আর যদি তুমি এখানে পড়তে রাজি না থাকো, তবে অন্য কিছু দাবি করো—আমি তোমাকে এখনই দশলাখ টাকার একটা চেক লিখে দিচ্ছি। ওই সামান্য ঘটনার জন্য এটা অনেক বেশি ক্ষতিপূরণ।'

তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাব শুনেও আমি চুপ করে রইলাম। সম্ভবত আমাকে এবারও চুপ করে থাকতে দেখে মৃদু আশঙ্কার জন্ম হল তাঁর মনে। ডাক্তার মজুমদার এরপর বললেন, 'দেখ তুমি পুলিশে যেতে পারো ঠিকই, কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। হয়তো আমাকে পুলিশে কিছু দিন টানা হ্যাঁচড়া করবে, মিডিয়া ক'দিন বদনাম করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হবে না কিছুই। টাকা আর ক্ষমতা শেষ কথা বলে। আর তা আমার আছে। মধ্যে থেকে তোমার জীবন বিষময় হয়ে উঠবে। শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাবে তোমার সামাজিক ভবিষ্যৎ। এ সোসাইটিতে ধর্ষিতা মেয়েদের জন্য সোশাল মিডিয়াতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, মোমবাতি মিছিল হয় ঠিকই, কিন্তু বিয়ে দেবার সময় বা প্রেম করার সময় সবাই ভার্জিন নারী খোঁজে। প্রতিবাদের ঝড় স্তিমিত হলে একলা হয়ে যায় সেই

মেয়ে। কেউ তখন তার কোনো খবর রাখে না। যারা তার জন্য একদিন প্রতিবাদ করেছিল তারা তখন মেতে ওঠে অন্য কোনো প্রতিবাদ প্রতিবাদ খেলায়...।'

এ পর্যন্ত শোনার পর আমি আর চুপ করে না থাকতে পেরে বলে উঠলাম, 'না, না, স্যার! আমি পুলিশের কাছে যাব না। জানি ওসব করে কোনো লাভ নেই। আপনি যা বলেছেন তাই সত্যি।'

আমার কথা শুনে থেমে গেলেন ডাক্তার মজুমদার। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তবে কী চাও তুমি বলো?'

আমি বলে উঠলাম, 'আমি আবার ক্লাসে ফিরতে চাই স্যার।'

কথাটা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি সত্যি বলছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, স্যার সত্যি। যা হবার তা হয়েছে। আমি আবার ক্লাসে ফিরতে চাই।'

প্রফেসর কয়েকমুহূর্ত চেয়ে রইলেন আমার দিকে। ধীরে ধীরে আবছা হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তিনি বুঝতে পারলেন শেষ পর্যন্ত স্নায়ু যুদ্ধে জিতে গেছেন তিনি। তিন মাস ধরে চলা শঙ্কার অবসান ঘটল তাঁর। মুখে তিনি যাই বলুন তাঁর কৃতকর্মের জন্য গত তিনমাস নিশ্চয় নিশ্চিন্ত ছিলেন না তিনি।

প্রফেসর আমার জবাব শুনে বললেন, 'দ্যাটস লাইক আ গুড গার্ল।'

তারপর বললেন, 'এবার তাহলে অন্য কথায় আসি। ইতিমধ্যে একটা সেমিস্টার হয়ে গেছে। মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে সেই সেমিস্টারে বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। চিন্তা নেই, ভালো ভাবেই পাশ করবে তুমি। আমার কথার দাম আছে। আর কাল থেকেই ক্লাস শুরু করো তুমি। কাল আমার ক্লাস আছে। আশা করি, ও ঘরে ঢুকতে কাল তোমার অসুবিধা হবে না। যা ঘটার তা ঘটে গেছে। ও কথা আর মনে এনো না।'

শেষ কথাটা কেন তিনি বললেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না আমার। কারণ, ও ঘরেই তো ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি এবার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বললাম 'না স্যার, ও ঘরে ঢুকতে আর কোনো অস্বস্তি হবে না। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'কী অনুরোধ?' জানতে চাইলেন তিনি।

আমি বললাম, 'কাল নয়, আমি আজ থেকেই ওখানে ক্লাস শুরু করতে চাই। ও ঘর থেকে বেরিয়েই তো কলেজ ছেড়েছিলাম আমি। দশ মিনিটের জন্য হলেও আপনি ওখানে গিয়ে আমাকে ক্লাস করান। যাতে আমি বুঝতে পারি সত্যিই কলেজ আমাকে ফিরিয়ে নিচ্ছে। আর সত্যিই যদি আমার মনের কোণে ওই ঘরটা সম্পর্কে কোনো অস্বস্তিবোধ লুকিয়ে থাকে, তবে তা কেটে যাবে। কাল ডিসেকশন রুমে ঢুকতে বা অ্যান্টি চেম্বারে ঢুকতে কোনো অসুবিধাই হবে না আমার।'

প্রফেসর কয়েকমুহূর্ত আমার প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা করলেন। তারপর হয়তো ভাবলেন আমাকে সন্তুষ্ট রাখাই ভালো। তাই একটু ইতস্তত করে এরপর বললেন, 'ঠিক আছে চলো, তোমার যখন ইচ্ছা তখন আজ থেকেই শুরু করো। কাল একটা বডি এসেছে। রেলের নক ডাউন কেস। মাস তিনেক বেওয়ারিশ লাশটা ওদের কাছেই পড়ে ছিল। সরকারি অনুমতি নিয়ে কালই ডিসেকশনের জন্য বডিটা এখানে আনা হয়েছে।' কথাটা বলে তিনি দেওয়ালের গা থেকে একটা চাবির গোছা খুলে নিয়ে

আমাকে নিয়ে তার ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও মনে হয় পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমরা এগোলাম ডিসেকশন রুমের দিকে।

৩

লাশ কাটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার বুকটা কেমন যেন করে উঠল ঠিক প্রথম দিনের মতোই। প্রথম দু-তিন দিন কী অস্বস্তি না হয়েছিল এ ঘরে ঢোকার পর। বাড়ি ফিরে ভালো করে খেতে পারিনি। রাতে মাকে জড়িয়ে ধরে শুতে হয়েছিল। তারপর অবশ্য ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে গেছিল সব কিছু। খুব স্বাভাবিকই মনে হতো ডিসেকশন টেবিলে শুইয়ে রাখা বডি সহ এ ঘরের সব কিছু।

চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলতে খুলতে ডাক্তার মজুমদার বললেন, 'ইনফ্যাক্ট তুমি না এলেও হয়তো এ ঘরে আসতাম আমি। বডিটা আনার পর আমি একঝলক দেখেছিলাম বডিটা। ভেবেছিলাম কাল ক্লাস শুরুর আগে আর একবার ভালো করে দেখে নেব বডিটা। তাই হরি ডোমকে বলেছিলাম বডিটা ফ্রিজার থেকে বাইরে বার করে ডিসেকশন টেবিলে রাখতে। বেলা দশটা নাগাদ সে কাজটা সেরে গেছে।'

দরজা খুললেন প্রফেসর মজুমদার। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগল। এসি চলছে ঘরে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ফর্মালিন দেওয়া মরদেহের পরিচিত গন্ধ এসে লাগল আমার নাকে। বেশ কয়েক মাস পর এলাম বলেই হয়তো গন্ধটা নাকে লাগল। নইলে দু-চারদিন এখানে থাকার পর আর গন্ধটা নাকে লাগে না।

দরজা খুলে দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপলেন প্রফেসর। মাথার ওপর থেকে ঝুলন্ত বাতিটা জ্বলে উঠল ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা ডিসেকশন টেবিলকে ঘিরে একটা বৃত্ত রচনা করে। আমি দেখতে পেলাম টেবিলের ঠিক মাঝখানে রাখা ডিসেকশন টেবিলকে ঘিরে একটা লাশ শোয়ানো আছে।

প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের ডিসেকশন রুম সরকারি হাসপাতালের ডিসেকশন রুমের মতো বড় না। মাঝারি আকৃতির এই ঘরটাতে ওই একটাই টেবিল। দেওয়ালের এক পাশে রাখা আছে লাশ রাখার জন্য একটা ফ্রিজার, আর একটা আলমারি। যাতে ডিসেকশনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি থাকে। আর এ ঘর সংলগ্ন একটা ঘর আছে। সেটা প্রফেসরের অ্যান্টি চেম্বার। ঘরটাতে ঢোকার পরই টেবিলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আমি তাকালাম সেই ঘরটার দিকে।

অ্যান্টি চেম্বারের দরজার পাল্লাটা খোলা। ভিতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার, সেদিনও অমনই অন্ধকার ছিল ঘরটা। আমি প্রফেসরের পিছন পিছন গিয়ে ঢুকেছিলাম ও ঘরটাতে। আর তারপর...। আমি আজও যেন কেঁপে উঠলাম সে ঘরের দিকে তাকিয়ে। ওই অন্ধকারের মধ্যেই তো প্রফেসর মজুমদার সেদিন যেন ধারালো স্ক্যালপেল চালাচ্ছিলেন আমার শরীরে। ঘটনার আকস্মিকতায়, আতঙ্কে এতটাই বিহ্বল হয়ে গেছিলাম যে অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও মৃত মানুষের মতোই আমার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোচ্ছিল না।

প্রফেসর মজুমদার এগিয়ে গিয়ে আলমারিটা খুললেন ডিসেকশন বা শব ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বার করার জন্য। আর আমি গিয়ে দাঁড়ালাম টেবিলের সামনে। সেখানে দাঁড়াতেই আমার মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই ঘটনাটার কথা।

তখন বিকাল। ঠিক এমনই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি জনা সাতেক ছেলে মেয়ের সঙ্গে। উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফেসর। একটা ডেডবডির লোয়ার অ্যাবডোমেন ওপেন করে অন্তর্যন্ত্রগুলো তিনি আমাদের বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার মনে হল তিনি কথা বলতে বলতে বারবার আমার পেটের দিকে তাকাচ্ছেন! কয়েকমুহূর্তের মধ্যে আমি ধরে ফেললাম যে ব্যাপারটা কী ঘটেছে! কোনোভাবে আমার শর্ট টপটা জিন্সের ওপর থেকে অর্থাৎ কোমরের ওপর থেকে ইঞ্চি খানেক ওপরে উঠে গেছে। উন্মুক্ত হয়ে গেছে আমার নাভি। আর সে দিকেই বার বার তাকাচ্ছেন প্রফেসর মজুমদার। আমি জানি নারীর নাভি পুরুষের যৌনতার উদ্রেক ঘটায়, কিন্তু প্রফেসর মজুমদারের ক্ষেত্রে সে ব্যাপারটা আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি। কারণ তিনি আমার শিক্ষক, আর আমার বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে প্রফেসর মজুমদারের বয়সিই হতেন। তিনি আমার পিতৃতুল্য। আমি তাড়াতাড়ি আমার টপটা টেনে নীচে নামিয়ে দিয়েছিলাম। তবে আজ জানি, সেদিন যদি তাঁকে আমি অবিশ্বাস করতাম তবে আমার মঙ্গল হতো। সেদিন ডিসেকশন শেষ হলে যখন ছাত্রছাত্রীরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল প্রফেসর আমাকে বললেন একটা নোটস দেবেন, একটু দাঁড়িয়ে যেতে। যদি সেদিন আমি তার দৃষ্টি পড়তে পারতাম তবে কিছুতেই একলা থাকতাম না এ ঘরে। কিছুতেই তাঁর পিছন পিছন যেতাম না তার ওই অ্যান্টি চেম্বারে। ভুল করেছিলাম আমি। তার খেসারত দিয়ে হয়েছে আমাকে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম টেবিলের সামনে। মিনিট তিনেকের মধ্যেই হাতে গ্লাভস পরে শব ব্যবচ্ছেদের সরঞ্জাম একটা ছোট ট্রেতে নিয়ে টেবিলের কাছে এলেন প্রফেসর মজুমদার। তিনি এসে দাঁড়ালেন টেবিলের ঠিক ওপাশে আমার ঠিক বিপরীতে। ঠিক যেমন সেই দুর্ঘটনার দিন যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। শব ব্যবচ্ছেদের ধারালো ছুরি অর্থাৎ স্ক্যালপেল ইত্যাদি জিনিসসহ ট্রেটা তিনি টেবিলের এক পাশে রাখলেন। তারপর চাদরটা ঠেলে শব দেহের কাঁধের নীচ পর্যন্ত নামিয়ে দিলেন। মৃতদেহটা দেখে চমকে উঠলাম আমি। থেঁতলানো মুখমণ্ডল। চোখ নাক মুখ কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। তবে তার চুল দেখে বুঝতে পারলাম সেটা নারী দেহ। তার দেহের যতটা অংশ উন্মুক্ত তা দেখে বুঝতে পারলাম তার রং বেশ ফর্সা ছিল, ঠিক আমারই মতো। আমার মতোই যুবতী ছিল সে। মেয়েটার থ্যাঁতলানো মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন, 'শুনেছি এখান থেকে বেশ দূরের এক স্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়েছিল মেয়েটা। টুকরো হয়নি ঠিকই তবে বাড়ি খেয়ে লাইনের পাশে ছিটকে পড়েছিল। ট্রেনের ধাক্কাতেই চুরমার হয়ে গেছিল ওর স্কালটা। তাতেই সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় মেয়েটা। তবে বডিটা অক্ষতই আছে।'

এ কথা বলার পর তিনি জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা—সেই দিন আমার ক্লাসে তুমি যখন ছিলে তখন আমি তোমাদের কী দেখাচ্ছিলাম মনে আছে?'

মৃদু হেসে আমি জবাব দিলাম, 'লোয়ার অ্যাবডোমেন।'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তবে সেটাই দেখা যাক।'

প্রফেসর মজুমদার এবার এক ঝটকায় বডির ওপর থেকে পুরো কাপড়টা সরিয়ে দিলেন। হ্যাঁ এটা কোনো যুবতীরই লাশ। ফর্সা দেহ। এখনও দেহটা তেমন বিকৃত হয়নি। বুকের কাছ থেকে পেট পর্যন্ত জেগে আছে সেলাই করা একটা চেরা দাগ। পোস্টমর্টেমের চিহ্ন। তাছাড়া মাথার ওপর থেকে ঝুলতে থাকা তীব্র আলোতে আর একটা জিনিস চোখে পড়ল আমার আর প্রফেসরের। তার শরীরের একটা জন্মদাগ। শবদেহের নাভির ঠিক ইঞ্চিখানের ওপরে নিটোল নাভির মতো দেখতে, বলা ভালো তার চেয়ে বড় আকৃতির একটা কালো জড়ুল!

সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সেদিকে চোখ রেখেই প্রফেসর মজুমদার বললেন, 'জড়ুলটা দেখেছ! ঠিক যেন কম্পাস বসিয়ে তৈরি করা!'

এরপর তিনি সেই নারী দেহের উদর উন্মুক্ত করার জন্য শব ব্যবচ্ছেদের ছুরি বা স্ক্যালপেলটা হাতে নিলেন। ছুরিটা মৃতদেহের গায়ে চালাবার আগে তিনি তাকালেন আমার দিকে। আমার টপটা এতক্ষণে কোমরের অনেক ওপরে উঠে গেছে। আজও সেদিনের মতো একই পোশাক পরে এসেছি আমি। তবে আজ আর অচেতনে নয়, প্রফেসর যখন শবদেহটার জড়ুলটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন ঠিক তখনই আমি সচেতন ভাবেই আমার টপটাকে বুক পর্যন্ত টেনে তুলেছি।

প্রফেসর আমার দিকে তাকাতেই তাঁর চোখ আটকে গেল আমার উন্মুক্ত শরীরের দিকে। আর তারপরই যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। অবিশ্বাস্য আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর মজুমদার। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁর। আর তারপরই মাটিতে পড়ে একদম স্থির হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁর দেহটার দিকে। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে কবজি স্পর্শ করে বুঝতে পারলাম তিনি আর কোনো দিনই জাগবেন না।

আমাকে তিনি সেদিন যখন পাশের ওই অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে গেছিলেন, তখন তিনি অন্ধকারে জড়ুলটা খেয়াল করেননি। কিন্তু আজ এই তীব্র আলোকবৃত্তের নীচে দাঁড়ানো আমার উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গে জড়ুলটা দেখতে পেয়েছেন তিনি। ঠিক যেমন নিটোল বৃত্তাকার জড়ুল আঁকা আছে সামনে টেবিলে শোয়ানো শবদেহের ঠিক একই জায়গাতে! শেষ পর্যন্ত আমি কে, শব দেহটা কার তা বুঝতে পারলেন প্রফেসর মজুমদার। আর তার পরই আতঙ্কে হার্টফেল করলেন।

কৃতকর্মের শাস্তি পেয়েছে ধর্ষক। এবার আমি শান্তি পাব। ফিরতে হবে আমাকে। ডিসেকশন রুম ছেড়ে বেরোবার আগে আমি একবার তাকালাম টেবিলে শোয়ানো লাশটার দিকে। তার মুখটা দেখে বেশ কষ্ট হল আমার। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল অপমানে ক্ষোভে অমনভাবে সেদিন ট্রেনের সামনে ঝাঁপটা না দিলে আমার সুন্দর মুখটা অমন বীভৎস হতো না। তবে টেবিলে পড়ে থাকা আমার ক্ষতবিক্ষত দোমড়ানো মুখটা আজও মাটিতে পড়ে থাকা প্রফেসর মজুমদারের মুখের থেকে অনেক বেশি সুন্দর। সে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। এবার আমাকে ফিরতে হবে।

হেমলক

তৃষিত অফিসে নিজের ছোট্ট ঘরটাতে বসে একটা কপি লিখছিল। চিফ রিপোর্টার সুপ্রকাশদা তার ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে তৃষিত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কপিটা প্রায় হয়ে গেছে দাদা। আর মিনিট দশেকের মধ্যে আপনার চেম্বারে গিয়ে দিয়ে আসছি।'

সুপ্রকাশদা বললেন, 'ওটা পরে দিলেও চলবে। তাড়া নেই। আসলে ''বড়সাহেব'' মানে আমাদের মালিক এসেছেন। তিনি তাঁর চেম্বারে ডেকেছেন তোমাকে।'

তৃষিত কথাটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। মালিক মানে পরিতোষ মুখার্জি। বেশ রাশভারী লোক। এ রাজ্যের একজন অন্যতম শিল্পপতি। তৃষিত মাত্র বছর দুই হল এই খবরের কাগজের অফিসে সাংবাদিক হিসেবে চাকরি করছে। কাগজের বিনোদনের পাতাটা সে দেখে। এই দু'বছরের মধ্যে দু-চারবার সে মালিকের মুখোমুখি হয়েছে কয়েকটা অনুষ্ঠানে। তবে সৌজন্য বিনিময় ছাড়া কোনও কথাবার্তা হয়নি। হবার কথাও নয়। তার মতো কনিষ্ঠ সাংবাদিককে তেমন প্রয়োজন হয় না মালিকের। কাগজের সম্পাদক আর চিফ রিপোর্টার ছাড়া কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেন না তিনি। কাজের প্রয়োজনে তৃষিতকে মাঝে মাঝে বিনোদন জগতের নানা সেলিব্রেটির সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাদের নিয়ে কাগজে লিখতে হয়। তবে কি তাদের মধ্যে কেউ কোনও অভিযোগ জানিয়েছে মালিকের কাছে? তৃষিত সুপ্রকাশদাকে বলল, 'রিপোর্টিং-এ কোথাও কোনও ভুল করে ফেলেছি নাকি? কেউ কোনও কমপ্লেন করেননি তো?'

সুপ্রকাশদা বললেন, 'সম্ভবত তা নয়। তাহলে চিফ রিপোর্টার হিসাবে তিনি প্রথমে আমার কাছেই জবাবদিহি চাইতেন, যেমন চেয়ে থাকেন। কারণটা আমি ঠিক জানি না। গিয়ে দেখো উনি কী বলেন?' ; এই বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সুপ্রকাশদা ঘর থেকে চলে যাবার পর তৃষিত ওয়াশরুমে গিয়ে যথাসম্ভব ফিটফাট হয়ে নিল। তারপর রওনা হল বড়সাহেবের চেম্বারের দিকে।

চেম্বারের বাইরে যে বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল তৃষিত তাকে মালিক ডেকেছেন জানাতেই সে চেম্বারে ঢুকে কয়েকমুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে বলল, 'যান, ভেতরে যান।'

বড়সাহেবের চেম্বারে প্রবেশ করল তৃষিত। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল ঘরটার ঠিক মাঝখানে ওক কাঠের বিরাট সেক্রিটেরিয়ট টেবিলের ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন বড়সাহেব। পরিতোষ মুখার্জি। তৃষিত তাঁর উদ্দেশে বলল, 'গুড আফটারনুন স্যার।'

বড়সাহেব মৃদু হেসে চোখের ইশারায় সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। তাঁর নির্দেশ পালন করে টেবিলের এপ্রান্তে মুখোমুখি একটা চেয়ারে তৃষিত বসল।

টেবিলের উপর একটু ঝুঁকে পড়ে নাকের ডগায় নেমে আসা বাইফোকালের উপর দিয়ে তিনি কয়েকমুহূর্ত তৃষিতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ''হেমলক'' শব্দটা শুনেছেন?'

যদিও পরিতোষ মুখার্জি ষাটোর্ধ্ব, আর তৃষিতের বয়স সাতাশ, মানে বয়সে সে অনেকটাই ছোট, তবুও সবাইকে ''আপনি'' সম্ভাষণ করে কথা বলাই বড়সাহেবের অভ্যাস।

তৃষিত জবাব দিল, 'হ্যাঁ স্যার, শুনেছি।'

'মানে জানেন? কী বলুন তো?'

তৃষিত বলল, 'এক ধরনের উদ্ভিদ। এর পয়জন হেমলক, বিষাক্ত প্রজাতির।'

'এ বিষয়ে আর কিছু জানেন?' আবার প্রশ্ন করলেন মুখার্জি সাহেব।

তৃষিত জবাব দিল, 'গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসকে এই হেমলকের রস পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।'

'ভেরি গুড!' প্রশংসাসূচকভাবে কথাটা বলে সোজা হয়ে বসলেন বড়সাহেব। এবার ভয়টা একটু কাটল তৃষিতের। তার মনে হল বড়সাহেব বকাঝকা করার জন্য ডাকেননি তাকে।

মুখার্জি সাহেব এরপর বললেন, 'এই হেমলক কথাটা শুনে আর কিছু মনে আসছে আপনার?'

তৃষিত একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার। একটা সফট ড্রিঙ্কস। হেমলক নাম। বাজারে ইদানীং বেশ চলছে।'

'খেয়ে দেখেছেন? কেমন?'

প্রশ্নটা শুনে একটু ইতস্তত করে তৃষিত জবাব দিল, 'হ্যাঁ, স্যার। ভালো। বাজার চলতি সফট ড্রিঙ্কসগুলোর থেকে একটু অন্যরকম এই ঠান্ডা পানীয়। বেশ ভালো।'

বড়সাহেব তৃষিতকে বললেন, 'আপনি জানেন নিশ্চয়ই, ''রেনবো'' নামে আমারও একটা সফট ড্রিঙ্কস কোম্পানি আছে। রেনবোর থেকে হেমলকের স্বাদ কি ভালো? আপনি নিশ্চয়ই খেয়েছেন।'

তৃষিত এবার বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। রেনবোর থেকে হেমলকের স্বাদ যথেষ্ট ভালো। কিন্তু সেটা খোদ রেনবোর মালিকের সামনে বলা উচিত হবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারল না তৃষিত।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বড়সাহেব তার রিভলভিং চেয়ারটা এপাশে ওপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'আপনার নিশ্চুপ থাকার কোনও কারণ নেই। সত্যিটা সব সময় সত্যি হয়। আপনার হয়ে জবাবটা আমিই দিচ্ছি। রেনবোর থেকে হেমলক স্বাদে ভালো। আর শুধু রেনবোর থেকে নয়, অন্যান্য যে সব দেশীয় ঠান্ডা পানীয় আছে তাদের সবার থেকে হেমলকই স্বাদে ভালো। আর এ ব্যাপারেই একটা আলোচনার জন্য আপনাকে ডেকেছি।'

বড়সাহেবের কথা শুনে মৃদু বিস্মিত হয়ে তৃষিত তাকাল তাঁর দিকে। বড়সাহেব সোজা হয়ে বসে বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, ওই স্বাদের জন্যই হেমলক পিছনে ফেলে দিচ্ছে আমাদেরকে। বড় বড় বহুজাতিক সংস্থার নরম পানীয়র কথা বাদই দিচ্ছি। কিন্তু আমরা যারা মাঝারি বা ছোট নরম পানীয়র ব্যবসা করি, তারা অনেক টাকা খরচ করেও কিছুতেই পেরে উঠছি না হেমলকের সঙ্গে। অথচ হেমলক বহুজাতিক কোম্পানি তো নয়ই, এমনকী সে আমাদের থেকেও ছোট কোম্পানি। কিন্তু কী চাহিদা তার! হেমলক চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিয়ে উঠতে পারছে না। যে একবার হেমলক খাচ্ছে সে অন্য কোনও পানীয় মুখে তুলছে না।'

মুখার্জি সাহেব এ পর্যন্ত কথাগুলো বলার পর তৃষিত ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করে বলে উঠল, 'কিন্তু আপনাদের এ নিয়ে আশঙ্কার কী কারণ? বলছেন তো খুব ছোট কোম্পানি। চাহিদা অনুসারে বাজারে জোগানই দিতে পারছে না।'

বড়সাহেব বললেন, 'এটা বাজারে চাহিদা বাড়াবার ব্যবসায়িক কৌশল হতে পারে। আবার যদি পুঁজি না থাকার কারণে হয়, তবে বেশি দিন সে সংকট থাকবে না। যার জিনিসের বাজারে এত চাহিদা তার কিছুদিনের মধ্যেই পুঁজি তৈরি হয়ে যাবে। অথবা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা বাড়াবে। তখন মুখ থুবড়ে পড়বে আমাদের মতো মাঝারি আর ছোট কোম্পানিগুলো।'

এ কথা বলে একটু থেমে মুখার্জি সাহেব বললেন, 'ওই পানীয়তে নিশ্চয়ই হেমলকের বিষ মেশানো হয় না। তবে তা খেলে কেউ বাঁচত না। তবে কীসের জন্য অমন স্বাদ সেটাই ধরতে পারছি না। হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, প্রত্যেক পানীয় প্রস্তুত সংস্থার আলাদা আলাদা গোপন রেসিপি থাকলেও তার পঁচানব্বই শতাংশই মোটামুটি এক হয় নরম পানীয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু হেমলকের রেসিপিতে কী এমন গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে যে তার কাছে পাত্তা পাচ্ছি না আমরা? নাকি প্রযুক্তির বিশেষ কোনও ব্যবহার? অনেক সময় টেম্পারেচার, মিক্সিং ইত্যাদির সামান্য কৌশল স্বাদের পার্থক্য তৈরি করতে পারে। আপনাকে একবার তাদের কোম্পানিতে যেতে হবে। কথা বলতে হবে মালিকের সঙ্গে।' আসল কথাটা এবার পাড়লেন বড়সাহেব।

'আমাকে?' বিস্মিতভাবে বলে উঠল তৃষিত।

বড়সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকেই। আমাদের বিনোদনের পাতার জন্য হেমলকের মালিক নীলকণ্ঠ গুপ্তর একটা ইন্টারভিউ নেবেন আপনি। সম্ভব হলে ফ্যাক্টরিটাও ঘুরে দেখবেন। ছবি তোলার চেষ্টা করবেন। নীলকণ্ঠ গুপ্ত যে আপনাকে রেসিপিটা জানিয়ে দেবেন সে আশা করি না। কারণ, এমন বোকা তিনি নিশ্চয়ই নন। কিন্তু হয়তো তাঁর কথার মধ্যে এমন কোনও সূত্র পাওয়া গেল, যেটা শুনে আমরা হয়তো ব্যাপারটা সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারলাম অথবা কোনও যন্ত্রাংশের ছবি হয়তো আমাদেরকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। সেই আশাতেই আপনাকে ওঁর কাছে পাঠানো। আর আপনাকে নির্বাচন করার পিছনে দুটো কারণ আছে। বিনোদন মানে তো শুধু সিনেমা-থিয়েটার নয়, খাদ্য-পানীয়র ব্যাপারটা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। লোকটা যদি আপনার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে আগাম খোঁজ নেয়, তবে দেখবেন আপনার বক্তব্য সত্যি। কারণ ওই পাতাতে আপনার নাম থাকে। আর দ্বিতীয় কারণ হল, কাজের ব্যাপারে আমি আপনাদের মতো তরুণদের ওপর বেশি আস্থাশীল। আপনাদের উদ্যম আর রিফ্লেক্স আমাদের মতো মানুষের চেয়ে বেশি হয়। কী, কাজটা করতে পারবেন তো?'

তৃষিত বলল, 'আমি নিশ্চয়ই করার চেষ্টা করব স্যার।'

বড়সাহেব বললেন, 'ভেরি গুড।' একথা বলার পর বড়সাহেব একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ওর অফিস। এখানে টেলিফোন নম্বর লেখা আছে। নিন, এবার কাজে লেগে পড়ুন। আমি আজ রাতের ফ্লাইটে দিন সাতেকের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে রিপোর্ট নেব। আর হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা অফিসের কাউকে জানাবার দরকার নেই। কেউ আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করলে বলবেন আমার যে 'চা'-এর ব্যবসা আছে সে ব্যাপারে কয়েকটা কাজ করে দেবার জন্য আমি আপনাকে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করছি। ব্যাপারটা আমি চিফ রিপোর্টারকেও জানিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

২

বড়সাহেবের চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল তৃষিত। নিজের চেয়ারে বসার পর কাগজের টুকরোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের কর্তব্য স্থির করে রিসিভার তুলে কাগজে লেখা ফোন নম্বরে তৃষিত ডায়াল করল। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর ওপাশে কেউ একজন ফোন ধরল। তৃষিত বলল, 'হ্যালো? এটা কি হেমলক কোম্পানি?'

ওপাশের লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, হেমলক। কিন্তু এখন আমাদের কাছে কোনও স্টক নেই। দিন সাতেক পর একবার খোঁজ নেবেন।' মাঝবয়সি এক লোকের গলা।

তৃষিত বলল, 'না আমি স্টকের ব্যাপারে কথা বলার জন্য ফোন করিনি। আমি কোম্পানির প্রপ্রাইটর মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' এই বলে নিজের নাম পরিচয় দিল তৃষিত।

কয়েকমুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর ওপাশের কণ্ঠস্বর বলল, 'আপনি সাংবাদিক? আমিই নীলকণ্ঠ গুপ্ত। বলুন কী ব্যাপার?'

তৃষিত বলল, 'আমাদের কাগজে শনিবারের বিনোদনের একটা পাতা আছে। খাদ্য পানীয়ও তো বিনোদনের অংশ। এ ব্যাপারে ওই পাতার জন্য আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই। টেলিফোনে তো সব কথা হয় না। যদি কিছুক্ষণের জন্য সামান-সামনি কিছুটা সময় দেন আমাকে?'

এ কথা শুনে নীলকণ্ঠ গুপ্ত যেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যা ছ'টায় আমার অফিসে চলে আসতে পারেন। তখন কথা বলা যেতে পারে। আমার অফিস অগরবাল ম্যানসন। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে।'

তৃষিত বলে উঠল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি আপনার অফিসে ঠিক ছ'টায় পৌঁছে যাচ্ছি।'

নীলকণ্ঠ গুপ্ত 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফোন রেখে দিলেন।

লোকটার সঙ্গে যে এত তাড়াতাড়ি দেখা করার সুযোগ মিলবে তা ভাবতে পারেনি তৃষিত। বেশ উৎসাহিত হল সে। নিজেকে কেমন যেন গোয়েন্দা গোয়েন্দা মনে হল তার। একটা রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে লোকটাকে কী কী প্রশ্ন করা যায় তা লিখতে শুরু করল সে। প্রশ্নমালা এক সময় তৈরি হয়ে গেল। সেগুলো মাথার মধ্যে গুছিয়ে ফেলে ঠিক পাঁচটার সময় বেরোবার জন্য সে উঠে পড়ল। শীতের বেলা, বাইরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামবে।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট তার অফিস থেকে কিছুটা দূরে হলেও নির্ধারিত সময়তেই সেখানে পৌঁছে গেল তৃষিত। একটা গলির ভেতর পাঁচতলা একটা পুরোনো বাড়ি। ছোট-বড় নানা কোম্পানির অফিস আছে সেখানে। লিফটম্যানকে জিগ্যেস করে লিফটে চেপে থার্ড ফ্লোরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল সে। একটা ঘর নিয়েই অফিসটা। দরজার মাথার উপর একটা সাইন বোর্ড ঝুলছে—'হেমলক ব্রেভারিজ'। পাল্লাটা ভেজানো। তৃষিত দরজাতে টোকা দিতেই ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ভেতরে চলে আসুন।'

ঘরের ভেতর প্রবেশ করল তৃষিত। মাঝারি আকৃতির একটা ঘর। চারপাশে কয়েকটা আলমারি। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল, তাকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। ছোট কোম্পানির অফিসঘরগুলো যেমন হয়।

টেবিলের মাথার উপর থেকে ঝুলন্ত একটা আলো নেমে এসেছে। আর ঠিক সেই আলোর নীচে বসে আছে মাঝবয়সি একজন লোক। মাথার চুল হালকা ধরনের। দাড়ি-গোঁফহীন মুখ। গায়ে একটা কালো তুষের চাদর জড়ানো। সব মিলিয়ে সাদামাটা চেহারার একজন ভদ্রলোক। লোকটা তাকে দেখে সৌজন্যসূচকভাবে মাথাটা ঝুঁকিয়ে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'আপনি সাংবাদিক তৃষিতবাবু তো? আমি নীলকণ্ঠ গুপ্ত। আপনি বসুন।'

হেমলকের প্রপ্রাইটর নীলকণ্ঠ গুপ্তর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল তৃষিত।

তাকে ভালো করে একবার দেখে নিয়ে নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'বলুন কী জানতে চান?'

তৃষিত বলল, 'খাদ্য-পানীয় তো এখন বিনোদনের প্রধান অঙ্গ। আপনাদের হেমলকের কথা এখন লোকের মুখে মুখে। আর আপনি এই কোম্পানির কর্ণধার। এ ব্যাপারে আমরা একটা সাক্ষাৎকার ছাপব আপনার।'

কথাটা শুনে নীলকণ্ঠবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'অবশ্যই সাক্ষাৎকার দেব। আমি নগণ্য মানুষ। আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন এটাই একটা বিরাট ব্যাপার। তাছাড়া আমি তো খবরের কাগজে হেমলকের বিজ্ঞাপন দিতে পারি না। সে সামর্থ্য এখনও হয়ে ওঠেনি। সাক্ষাৎকারটাই বিজ্ঞাপনের কাজ করবে।'

তৃষিত হেসে বলল, 'তা তো করবেই। আমি আপনার সাক্ষাৎকারটা মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে নেব।'—এই বলে তৃষিত পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু নীলকণ্ঠবাবু তার চাদরের আড়াল থেকে বাম হাতটা বার করে তৃষিতকে থামাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'না, ওটা থাক। আসলে ওই রেকর্ডিং-এর ব্যাপার হলে আমি নার্ভাস হয়ে যাব। গুছিয়ে কথা বলতে পারব না। কথাবার্তা এমনিই হোক। পরে আপনি সে কথাগুলো লিখে নেবেন। তবে আপনার চিন্তা নেই। আমি মিথ্যা বলি না। আর কোনও কথা বলার পর সে কথা অস্বীকারও করি না।'

রেকর্ডিংটা করে রাখলে কাজের সুবিধা হতো তৃষিতের। কিন্তু লোকটা যখন নিষেধ করছে তখন তাকে এ ব্যাপারে রাজি করানোর চেষ্টা না করাই ভালো। বলা যায় না—লোকটার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ জাগতে পারে, এমনকী বিগড়েও যেতে পারে লোকটা। কাজেই এ কথা ভেবে নিয়ে তৃষিত বলল, 'ঠিক আছে রেকর্ডিং করছি না। শুধু মুখে মুখেই কথা হোক। তবে আমি প্রশ্নগুলো করি?'

নীলকণ্ঠবাবু তাঁর হাতটা আবার চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'হ্যাঁ, করুন।'

তৃষিত প্রথম প্রশ্ন করল তাঁকে, 'আপনার পানীয়ের তেমন কোনও বিজ্ঞাপন না থাকলেও হেমলকের নাম তার স্বাদের জন্য লোকের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে। কীভাবে গড়ে তুললেন এই

কোম্পানি?'

মৃদু চুপ করে থেকে নীলকণ্ঠবাবু প্রথমে বললেন, 'এখনও পুরো গড়ে তুলতে পারিনি। তবে যতটুকু গড়েছি তা গড়ে উঠেছে আমার রক্ত আর পরিশ্রমের বিনিময়ে। আমাকে বাঁচার জন্য এ ব্যবসায় দাঁড়াতেই হবে এ ভাবনা থেকে।'

তারপর তিনি বললেন, 'জানেন আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন কবিরাজ। অর্থাৎ দেশিয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। নানা গাছগাছড়া থেকে ওষুধ বানাতেন। কিন্তু তথাকথিত আজকের এই আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি এদেশে চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজির পসারও কমতে শুরু করল। আমার ঠাকুর্দার আমল থেকেই এই ঘটনাটা শুরু হয়েছিল, কিন্তু বাবার সময় এসে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল এই পারিবারিক পেশা। সংসার অচল হয়ে গেল আমাদের। পারিবারিক সূত্রে আমি কিছুটা ভেষজ ওষুধপত্রের ব্যবহার শিখে নিলাম। বাবার মৃত্যুর পর আমি চেষ্টা করলাম সে সবের কারবার করার। শিয়ালদা স্টেশনের পাশে প্রথমে একটা ভেষজ ওষুধের দোকান দিলাম। চলল না। তারপর নানা কাজ করেছি আমি। এমনকী ট্রেন কম্পার্টমেন্টে হজমি গুলি বিক্রি পর্যন্ত।

পনেরো-কুড়ি বছর এভাবে কোনও রকমে বেঁচে থাকার পর একজন আমাকে খবর দিল যে কলকাতার কিছুটা দূরে এক মাড়োয়ারি খুব ছোট্ট একটা সফট ড্রিঙ্কসের কারখানা খুলেছিল। কিন্তু উৎপাদন শুরু না করেই সে সেটা লিজে দিয়ে দিতে চায়। জলের ব্যবসাতে নাকি অনেক পয়সা, যদি আমি সেটা ঠিকমতো চালাতে পারি। তখন আমার একদম কোণঠাসা অবস্থা। সম্পত্তি বলতে কলকাতায় আমাদের পৈতৃক বাড়িটা ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। ভাবলাম জীবনে প্রথমবারের জন্য একটা জুয়া খেলি। হয় ঘুরে দাঁড়াব, না হয় শেষ হয়ে যাব। আমি বিয়ে-থা করিনি। কিছুদিন আগে আমার শেষ টানটুকু আমার মা'ও প্রায় না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। আমার তখন হারাবার মতো কিছু ছিল না। কাজেই "যা আছে কপালে" বলে বাড়ি-জমি বেচে দু'বছর আগে লিজ নিয়ে নিলাম ওই ছোট্ট কারখানা। পাঁচ-ছ'জন কাজ জানা লোক জোগাড় করে ব্যবসা শুরু করলাম। প্রথম প্রথম তো আমি ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তারপর আবার ধীরে ধীরে...।'

তৃষিত বলে উঠল, 'তারপর আবার ধীরে ধীরে আপনার রক্ত-ঘাম-পরিশ্রমের বিনিময়ে হেমলককে তুলে ধরলেন, তাই তো?'

নীলকণ্ঠবাবু শান্তস্বরে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

তৃষিত বলল, 'আপনার হেমলকের তো এত চাহিদা। একদম সাধারণ মানুষ থেকে বড় বড় মানুষও এই পানীয়ের প্রেমে পাগল। আমি কিছুদিন আগে একটা ফিল্ম স্টুডিয়োতে এক নায়িকার ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলাম। তিনি হেমলকের বোতলে চুমুক দিতে দিতে আমাকে ইন্টারভিউ দিলেন। যে পানীয়ের এত চাহিদা তার জোগান নেই কেন?

নীলকণ্ঠবাবু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। এই যে আপনি এখানে এলেন কিন্তু আপনাকে হেমলক খাওয়াতে পারছি না। একটাও বোতল নেই। সব শেষ। আমার কারখানার ফ্রিজে হয়তো

একটা-দুটো বোতল থাকতে পারে। আসলে হেমলক বানাতে একটা জিনিস লাগে। সেটা সবসময় পাওয়া যায় না। তাই প্রোডাকশন বন্ধ রাখতে হয়। হেমলকের গুণমানের সঙ্গে তো আর আপোস করা যায় না।'

তৃষিত প্রশ্ন করল, 'আপনার পানীয়ের নাম হেমলক দিয়েছেন কেন? হেমলক তো বিষ?'

নীলকণ্ঠবাবু হেসে বললেন, 'যদিও আজকাল সংবাদপত্রে অনেক সময় লেখা হয় যে, বহুজাতিক সংস্থার নরম পানীয়তে কীটনাশকের উপস্থিতি মিলেছে, কিন্তু হেমলকের ব্যাপারে আমি হলফ করে বলতে পারি যে, তেমন কোনও বিষাক্ত পদার্থ এতে মেশানো নেই। হ্যাঁ, হেমলক হল বিষ। কিন্তু বিষের মধ্যেই অমৃত লুকিয়ে থাকে। বেদনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে আনন্দের স্বাদ। বলতে পারেন মজা করেই আমার এই পানীয়ের নাম রেখেছি হেমলক।'

তৃষিত বলল, 'পাঠকদের নিশ্চয়ই আগ্রহ থাকবে কীভাবে হেমলক তৈরি হয় সেটা জানতে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?' কৌশলে তার চতুর্থ প্রশ্নটা করল তৃষিত।

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। যেমনভাবে সব নরম পানীয় প্রস্তুত হয়। পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সঙ্গে চিনি আর বর্ণ-গন্ধের জন্য নানা সিরাপ বা যৌগ মিশিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে বোতলগুলো সিল করা হয়।'

তৃষিত বলল, 'ওই সিরাপের ব্যাপারটাই আসল, তাই না?'

একটু চুপ করে থেকে নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সেটাই আসল। খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থার এসব ব্যাপারে নিজস্ব গোপন ফর্মূলা থাকে।

তৃষিত বুঝতে পারল অন্য কোনও পানীয় প্রস্তুতকারককে এ প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যেত, নীলকণ্ঠবাবুও স্বাভাবিকভাবেই একই জবাব দিলেন। গোপন ফর্মূলা তো আর কেউ বাইরে বলবেন না।'

তৃষিত বলল, 'আমার শেষ প্রশ্ন, হেমলকপ্রেমীদের কাছে আপনার বার্তা কী?'

নীলকণ্ঠবাবু হেসে বললেন, 'হেমলকই হল জীবন, আর জীবনই হল হেমলক। হেমলক পান করুন, জীবন উপভোগ করুন।'

প্রশ্নোত্তর পর্ব মোটামুটি শেষ হল। তৃষিত এবার তার আসল প্রস্তাবটা পাড়ল। 'আপনার কাছে আমার আর একটা অনুরোধ আছে। আপনি যদি আপনার কারখানাটা একবার ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তবে ভালো হয়। আপত্তি না থাকলে কারখানার ছবি নেব। আর আমার লেখাতেও অনেক সুবিধা হবে তাতে।'

কথাটা শুনে নীলকণ্ঠবাবু সাবলীলভাবে বললেন, 'বেশ তো আসুন না। আমার কারখানাটা ডায়মন্ডহারবারের দিকে। এখন অবশ্য প্রোডাকশন বন্ধ আছে। আমি যদি দু-চার দিনের মধ্যে টেলিফোন করি তবে আপনি নিশ্চয়ই সেখানে চলে যেতে পারবেন! আসলে এ ক'দিন আমার কী কী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সেটা একবার আমাকে দেখে নিতে হবে। তাছাড়া বোঝেনই তো, হঠাৎ করে কখন কী কাজ এসে পড়ে! কাজেই ঠিক এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে সময়টা বলতে পারছি না।'

তৃষিত বলল, 'আমার কোনও অসুবিধা হবে না। ঘণ্টা দুয়েকের তো পথ। আপনি ফোন করলেই আমি পৌঁছে যাব।' এই বলে তৃষিত তার ফোন নম্বর লেখা ভিজিটিং কার্ডটা এগিয়ে দিল নীলকণ্ঠবাবুর দিকে।

কার্ডটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই ডেকে নেব আপনাকে। আমাকে এবার অফিস বন্ধ করে বেরোতে হবে। খুব খারাপ লাগছে যে, আপনি আমার অফিসে এলেন কিন্তু আপনাকে হেমলক খাওয়াতে পারলাম না। আমার ফ্যাক্টরিতে যেদিন যাবেন, সেদিন চেষ্টা করব খাওয়াতে। দেখা হবে।' এই বলে নীলকণ্ঠবাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

নীলকণ্ঠবাবুকে নমস্কার জানিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে লিফটের দিকে এগোল তৃষিত। প্রাথমিক সাক্ষাতে নীলকণ্ঠবাবুকে বেশ সরল-সাধারণ মানুষ বলেই মনে হল তার। বিশেষত, ব্যবসায়ীসুলভ কোনও আত্ম-অহংকার লোকটার মধ্যে নেই।

দু'দিন পর সকালবেলা কিন্তু নীলকণ্ঠবাবু সত্যিই ফোন করলেন, 'আজ চলে আসুন...।'

৩

বেলা দশটা নাগাদ নীলকণ্ঠবাবুর টেলিফোন পেয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিল তৃষিত তার বাইক নিয়ে। অফিসের গাড়ি নিলে ড্রাইভার ব্যাপারটা জেনে যেত। আর সেখানে ট্রেনে যাওয়া সমস্যার। কারণ, নীলকণ্ঠবাবু তাঁর কারখানার অবস্থান যে জায়গাতে বলে জানিয়েছেন তা রেলস্টেশন থেকে চোদ্দো-পনেরো কিলোমিটার দূরে। ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে গেলেই সুবিধে হবে। তাই বাইক নিয়েই বেরিয়েছিল তৃষিত।

কলকাতা ছাড়াতেই ফাঁকা রাস্তা। শীতের নরম রোদ পিঠে লাগিয়ে বাইক চালাতে তৃষিতর ভালোই লাগছিল। রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা মাঠ; ধানের খেত, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গঞ্জের মতো জায়গা। গ্রামীণ মানুষজন। ধুলো-দূষণহীন এ এক অন্যরকম পরিবেশ।

নীলকণ্ঠবাবুর সেদিনের কথোপকথন নিয়ে দু'দিন ধরে চিন্তা করেছে তৃষিত। হেমলকের রেসিপির ব্যাপারে একটা ভাবনা তার মাথায় এসেছে। নীলকণ্ঠবাবুরা তো বংশ পরম্পরায় কবিরাজ ছিলেন। হয়তো তিনি হেমলকের সঙ্গে গাছ-গাছড়ার এমন কোনও আরক বা নির্যাস মেশান যা হেমলকে অদ্ভুত স্বাদ এনে দেয়। নীলকণ্ঠবাবু হেমলকের যে কাঁচা মালের অপ্রতুলতার কথা বললেন, তা কোনও দুষ্প্রাপ্য গাছ বা তার শিকড় হতে পারে। যা হয়তো সহজে পাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে নরম পানীয় কীভাবে তৈরি হয় তা নেট ঘেঁটে দেখেছে তৃষিত। তাতে কাঁচামাল হিসাবে যেসব জিনিসের কথা বলা আছে বাজারে তা সহজলভ্য। তার অভাবে উৎপাদন বন্ধ হবার কথা নয়। তৃষিতের তাই ধারণা হয়েছে যে, সেই কাঁচামাল কোনও দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া হতে পারে।

বেলা দুটো নাগাদ জায়গাটার কাছাকছি পৌঁছে গেল সে। রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে চা খেতে বাইক থামাল সে। চা পানের পর তৃষিত বাইক নিয়ে রওনা হয়ে কিছুটা এগিয়ে পাকা রাস্তা

ছেড়ে একটা কাঁচা পথ ধরল। মাইলখানেক চলার পর অবশেষে সে পৌঁছে গেল নীলকণ্ঠবাবুর কারখানার সামনে।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিঘেখানেক জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হেমলকের কারখানা। তবে তা বেশি বড় নয়। মাথায় টিনের শেডওয়ালা একটা লম্বাটে বাড়ি। প্রবেশপথের মাথায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'হেমলক'। মেইন গেটটা একটি ফাঁক করা। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তৃষিত বারকয়েক বাইকের হর্ন বাজাল। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না বলে তৃষিত একটু ইতস্তত করে গেটের ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কারখানার সামনের চত্বরটা শান বাঁধানো। সেখানে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে হেমলকের ফাঁকা কার্টন, বোতল, নানা ধরনের ছোট-বড় পাত্র বা কনটেনার ইত্যাদি। জায়গাটার এক পাশে একটা ঘরের গায়ে 'অফিস' কথাটা লেখা আছে দেখে তৃষিত বাইক নিয়ে সে ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন নীলকণ্ঠবাবু। আজও তাঁর গায়ে সেই তুষের কালো চাদরটা জড়ানো। তৃষিতকে দেখে নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'আসুন, আসুন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।'

বাইক থেকে নেমে গাড়িটা দাঁড় করাতে করাতে তৃষিত বলল, 'এখানে কোনও লোকজন নেই? নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'প্রোডাকশনের সঙ্গে যুক্ত বলতে মাত্র চার-পাঁচজন লোক। আমার তো ছোট ফ্যাক্টরি। আর বলতে গেলে সব মেশিনেই হয়। এখন প্রোডাকশন বন্ধ তাই লোকজনও নেই।'

নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে তাঁর অফিসঘরে ঢুকল তৃষিত। ঘরের চারদিকে কাগজপত্র ঠাসা আলমারি। হেমলকের কিছু হোর্ডিং, ব্যানারও আছে। তাছাড়া টেবিল-চেয়ার তো আছেই। নীলকণ্ঠবাবুর চেয়ারের একপাশে দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট ফ্রিজও রয়েছে। টেবিলের দু'পাশে দুজন মুখোমুখি বসার পর নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'এতটা পথ বাইক চালিয়ে এসেছেন একটু জিরিয়ে নিন। আপনার এখানে আসতে কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

তৃষিত বলল, 'অসুবিধা হয়নি। জায়গাটা দূর হলেও রাস্তাটা মোটামুটি সোজাই। তবে এ অঞ্চলটা বেশ পলিউশন ফ্রি। শান্ত নিরিবিলি।'

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, চারপাশে শুধুই ধানখেত। আগে এলে হয়তো দু-একজন লোককে ধানখেতে চোখে পড়ত আপনার। কিন্তু এখন তারাও শীতের ধান কেটে নিয়ে চলে গেছে। ফ্যাক্টরি চালাবার পক্ষে জায়গাটা আদর্শ। কোনও ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট নেই।'—এ কথা বলার পর নীলকণ্ঠবাবু চেয়ারে বসা অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে ফ্রিজ খুলে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা হেমলকের বোতল বের করে টেবিলে রেখে বললেন, 'একটাই বোতল অবশিষ্ট ছিল। সেদিন আপনাকে খাওয়াতে পারিনি। আজ খান। তবে ওপেনার নেই। আপনাকে দাঁত দিয়ে ছিপি খুলতে হবে।'

বোতলটা দেখে তৃষিতের মনে হল সে যদি না খেয়ে বোতলটা সঙ্গে করে নিয়ে যায় তবে সেটা পরে কাজে লাগতে পারে কোনও পরীক্ষার জন্য। তাই সে বলল, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে বোতলটা সঙ্গে করে নিয়ে যাব ফেরার পথে রাস্তায় খাবার জন্য। আসলে একটু আগেই আমি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছি। সঙ্গে জল নেই। ফেরার পথে বোতলটা কাজে লেগে যাবে।'

তৃষিতের কথা শুনে নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, নিয়ে যান, নিয়ে যান। কোনও অসুবিধা নেই।'

বোতলটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে তৃষিত বলল, 'আপনাদের প্রোডাকশন আবার কবে নাগাদ শুরু হতে পারে? কালকেই একটা ঠান্ডা পানীয়ের দোকানে দেখলাম একটা ছেলে হেমলকের খোঁজ করছিল।'

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে তৃষিতের দিকে তাকিয়ে নীলকণ্ঠবাবু জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, কাঁচামাল এসে গেছে। আশা করি, আর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই হেমলকের কিছু বোতল বাজারে ছাড়তে পারব। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত পারি কিনা?'

এরপর বেশ কিছু মামুলি কথাবার্তার পর নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'চলুন তবে এবার ফ্যাক্টরিটা আপনাকে দেখিয়ে আনি?'

তৃষিত বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে একবার একটু ইউরিনালে যেতে পারলে ভালো হয়।'

নীলকণ্ঠবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাইরে চলুন। এ ঘরের পিছন দিকে একটা ইউরিনাল আছে।'

বাইরে বেরিয়ে এল তারা দু'জন। নীলকণ্ঠবাবুর দেখানো রাস্তায় ইউরিনালে গিয়ে ঢুকল তৃষিত। দরজা বন্ধ করে মোবাইল ফোনের মুভি ক্যামেরাটা চালু করে সেটা তার জ্যাকেটের বুক পকেটে তৃষিত এমনভাবে রাখল যাতে ফোনের ক্যামেরার অংশটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। কারখানার ভেতরের অংশের ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন বড়সাহেব। যদিও কারখানার ছবি তোলার কথা নীলকণ্ঠবাবুকে এর আগে জানিয়েছে তৃষিত। কিন্তু কারখানার ভেতরের অংশের ছবি বা বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের ছবি তুলতে নাও দিতে পারেন নীলকণ্ঠবাবু। কাজেই এ পথ নেওয়াই ভালো। তৃষিত চটপট কাজ সেরে ইউরিনাল থেকে বেরিয়ে নীলকণ্ঠবাবুর কাছে ফিরে এল। তিনি তাকে নিয়ে এগোলেন কারখানার দিকে।

৪

নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে তৃষিত প্রবেশ করল কারখানার ভেতরে। প্রথমে বিরাট বড় একটা ঘরে ঢুকল তারা। বিশাল বড় একটা ধাতব গ্লোবের মতো আধার আছে সেখানে। মাটি থেকে আর দেওয়ালের গা বেয়ে নানা রকমের নল এসে যুক্ত হয়েছে সেই গ্লোবের সঙ্গে। নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'এ ঘরটাকে ফ্যাক্টরির আঁতুড়ঘর বলতে পারেন। এই যে বিশাল গ্লোবের মতো দেখছেন ওতে জল পিউরিফাই হয় অর্থাৎ পরিশুদ্ধ হয়। কিছু খনিজ লবণও মেশানো হয় জলের সঙ্গে। তারপর মানুষের পান করার উপযোগী পরিশুদ্ধ জল নলবাহিত হয়ে চলে যায় পাশের ঘরটাতে। যে ঘরটাকে আমরা ফ্যাক্টরির হেঁশেল বা কিচেন রুম বলি।'

তৃষিত ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে লাগল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠবাবুর অগোচরে তৃষিতের বুক পকেটের মোবাইল ক্যামেরা চলমান ছবি তুলে যেতে থাকল।

ঘরের মধ্যে দিয়েই এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার জায়গা। নীলকণ্ঠবাবু এরপর তৃষিতকে নিয়ে প্রবেশ করলেন তার রসুইঘরে। প্রথম ঘরের থেকে এ ঘরটার আকৃতি দ্বিগুণ বলা যায়। এ ঘরে নানা বিরাট মুখ হাঁ-করা পাত্র আছে ছোট-বড় নল দিয়ে যুক্ত। তাদের নলগুলো আবার মিশেছে ঘূর্ণায়মান একটা সিলিন্ডারের সঙ্গে। আর এ ঘরের বিশেষত্ব হচ্ছে এখান থেকে একটা লম্বা কনভেয়ার বেল্ট বা চলমান চওড়া ধাতব ফিতা ঘরের এক প্রান্ত থেকে একটা যন্ত্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে সোজা সামনের আর একটা ঘরের ভেতর প্রবেশ করেছে দেওয়ালের গায়ের ফোকর দিয়ে। কনভেয়ার বেল্টের উপর ছ'ইঞ্চি দূরত্ব বরাবর তার খাঁজে হেমলকের বোতল বসানো। এছাড়া নানা ছোট-বড় যন্ত্রপাতি তো এ ঘরে আছেই। অবাক হয়ে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল তৃষিত। নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'বলতে পারেন এ ঘরেই হেমলক তৈরির নিরানব্বই শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। ওই যে হাঁ-করা পাত্রগুলো দেখছেন ওখানে হেমলক তৈরির কাঁচামাল ঢালা হয়। সেগুলো কয়েকটা প্রক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে মেশে ওই সিলিন্ডারে রাখা পরিশোধিত জলের সঙ্গে। তারপর আরও কয়েকটা প্রক্রিয়ার পর কনভেয়ার বেল্টে রাখা হেমলকের বোতলে বন্দি হয়।'

তৃষিত একটু কায়দা করে জানতে চাইল, 'কাঁচামাল মানে?'

নীলকণ্ঠবাবু জবাব দিলেন, 'চিনি, কিছু জিনিসের নির্যাস, তাছাড়া স্বাদ-গন্ধ-বর্ণের জন্য খাবার উপযোগী কিছু রাসায়নিক ইত্যাদি।'

তৃষিত গিয়ে দাঁড়াল কনভেয়ার বেল্টের সামনে পানীয় ভর্তি সার সার হেমলকের বোতল। বোতলগুলোর মুখ পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের কাগজ দিয়ে সিল করা। নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'বলতে পারেন এগুলো প্রায় ফিনিশড প্রোডাক্ট। তবে সিলগুলো টেম্পোরারি। কনভেয়ার বেল্ট বাহিত হয়ে এরা চলে যাচ্ছে পাশের ঘরে। সেখানে যন্ত্রের মাধ্যমে সিল খুলে যায়। শুধু একটা জিনিস সেখানে মেশানো হয়। তারপর ছিপি বসে যায় বোতলের মুখে। তৈরি হয়ে যয় হেমলক।'

হেমলকের রসুইঘরটা তৃষিত ভালো করে দেখার পর নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'আসুন এবার আপনাকে কারখানার শেষ ঘরটা দেখাব।'

তৃষিতকে নিয়ে নীলকণ্ঠবাবু দাঁড়ালেন তৃতীয় ঘরের প্রবেশ মুখে। তবে এখানে কিন্তু ইস্পাতের একটা দরজা আছে। তালা ঝুলছে তাতে। চাবি বার করে তালা খুলতে খুলতে হেমলকের মালিক নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'এ ঘরে কিন্তু আমার অন্য কর্মচারীরাও ঢুকতে পায় না। শেষ কাঁচামালটা এ ঘরেই আমি মেশাই। বলতে পারেন সেটাই হেমলকের গোপন রেসিপি। আপনি এত আগ্রহ নিয়ে ফ্যাক্টরি দেখতে এসেছেন তাই এ ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।'

তৃষিত বেশ খুশি হল কথাটা শুনে।

নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে সে-ঘরে প্রবেশ করল তৃষিত। ঘরটার একটা অংশ প্ল্যাটফর্মের মতো উঁচু। কোনও জানলা নেই এ ঘরে। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত একটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে প্ল্যাটফর্মটা। তার ঠিক নীচে রয়েছে পাশের ঘর থেকে দেওয়াল ফুঁড়ে আসা বেল্টটা। কাঠের প্ল্যাটফর্মের এক জায়গাতে বিরিয়ানির হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড পাত্র আছে। আর তার নীচের অংশটা সরু হতে হতে

শেষে একটা তীক্ষ্ন মুখওয়ালা ফানেলের রূপ নিয়েছে। কনভেয়ার বেল্টটা কিন্তু সোজা এগিয়ে উল্টোদিকের দেওয়ালের ফোকর গলে বাইরে বেরিয়ে গেছে। আর তার আগে কনভেয়ার বেল্টের উপর আর একটা ছোট যন্ত্র বসানো আছে। কাঠের প্ল্যাটফর্ম যেদিকে সেদিকের দেওয়ালে একটা ছোট অ্যান্টি চেম্বারের মতো ঘর আছে। তৃষিতকে নিয়ে কাঠের প্ল্যাটফর্মটার উপর উঠে সেই হাঁড়ির মতো আধারটার সামনে দাঁড়ালেন নীলকণ্ঠবাবু।

পাত্রটা যে কাঠামোর উপর আছে তার গায়ে একটা সুইচ দেখিয়ে নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। পাত্রটার ভেতর দাঁত আছে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। এই বোতামটা চালু করে পাত্রের ভেতর কিছু ফেললেই কাঁটাগুলো সেটাকে পিষে রস বার করতে শুরু করে। সেটা গিয়ে জমা হয় নীচের ফানেলে। কনভেয়ার বেল্টটা চালু হয়ে যায়। বেল্ট বেয়ে পাশের ঘর থেকে বোতলগুলো এসে থামে এই সূচিমুখ ফানেলের নীচে। ফানেলের মুখটা ওঠা-নামা করে ছন্দোবদ্ধভাবে। অ্যালুমিনিয়াম কাগজ ভেদ করে প্রতিটা বোতলের ভেতরে এক ফোঁটা তরল প্রবেশ করানো হয় ফানেলের মুখ দিয়ে। সেলাই মেশিনের সূচের মতোই ওঠা-নামা করে বিশাল এই পাত্রের নীচের ফানেলটা। ফানেলের বাহিত তরলের ফোঁটা বোতলে প্রবেশ করার পরই সেটা এগিয়ে যায়। তারপর কনভেয়ার বেল্টের উপর আর একটা যে ছোট যন্ত্র দেখছেন তার মাধ্যমে ছিপি এঁটে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমেই দেওয়ালের ওপাশে বেরিয়ে যায়। ওপাশে একটা বড় বাস্কেট আছে। তার মধ্যে গিয়ে জমা হয় বোতলগুলো। সেখান থেকে বোতল সংগ্রহ করে বাজারে পাঠাবার জন্য কাগজের বাক্সে ভরা হয়। এই হল পুরো ব্যাপারটা।'

নীলকণ্ঠবাবু তৃষিতকে বুঝিয়ে দিলেন এ ঘরের যন্ত্রগুলোর ব্যাপারে।

তৃষিত যথাসম্ভব ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল ঘরের যন্ত্রপাতিগুলোকে।

বিশাল হাঁড়ির মতো পাত্রটার ভেতরটাতে উঁকি দিয়ে দেখছিল তৃষিত। একটা মানুষ ঢুকে যেতে পারে তার মধ্যে। ঠিক এমন সময় নীলকণ্ঠবাবু বলে উঠলেন, 'এ ঘরে হেমলকে কী মেশানো হয় সেটাই হয়তো আপনি জানতে চান তাই না? সেটা জানার জন্যই তো আপনি আসলে এখানে এসেছেন? হেমলকের গোপন ফর্মূলা?'

কথাটা শুনে মৃদু চমকে উঠে তৃষিত তাকাল নীলকণ্ঠবাবুর দিকে। আবছা হাসি ফুটে উঠেছে নীলকণ্ঠবাবুর ঠোঁটের কোণে। তৃষিতকে অবাক করে দিয়ে তিনি এরপর বললেন, 'আপনার কাগজের কোম্পানির মালিক আর রেনবো পানীয়র মালিক তো একই ব্যক্তি—পরিতোষ চ্যাটার্জি। ঠিক কিনা? আর তিনিই আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে। আপনার জ্যাকেটের বুক পকেটে রাখা মোবাইল ফোনে একটা আলোকবিন্দু যে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে সেটাও খেয়াল করেছি আমি। সম্ভবত মোবাইল ফোনের ক্যামেরাটা ছবি তুলে চলেছে চারপাশের।'

ধরা পড়ে গেছে তৃষিত। সে কী বলবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। তার অবস্থা দেখে নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, লজ্জা পাবার কিছু নেই। আপনি যে ব্যাপারটা জানার

জন্য এখানে এসেছেন সে ব্যাপারটা বলব আপনাকে। একটু গোড়া থেকেই খুলে বলি সে ঘটনার কথা—'

নীলকণ্ঠবাবু মৃদু চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, 'আপনাকে তো বলেইছি এই কারখানাটা আমি কীভাবে কিনেছিলাম। কারখানা তো কিনলাম, চালুও করলাম। কিন্তু নামী-দামি কোম্পানির সঙ্গে লড়াই করে বাজার ধরা কি মুখের কথা? তার ওপর বিজ্ঞাপন দেবার সামর্থ্য ছিল না। কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, এ ব্যবসাতে আমি ডুবতে চলেছি। একসময় অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে বেতন না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দিল কর্মীরা। তখন আমার সামনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও পথই খোলা নেই। বাজারে বেশ দেনাও হয়ে গেছে। ঠিক এমন সময় অনেকটা কাকতালীয়ভাবে একটা ছোট ক্যাটারার সংস্থা আমাকে মাত্র একশো বোতলের অর্ডার দেয়। কর্মীরা তখন কাজ বন্ধ করে দিলেও কয়েকশো বোতল তখনও এই কারখানায় প্রায় তৈরি হয়ে বসেছিল। শুধু শেষ জিনিসের একটা ফোঁটাই তখন মেশানো বাকি ছিল বোতলে।

অর্ডারটা পেলে যে দু-তিনশো টাকা আমার লাভ তখন সে টাকাই আমার কাছে অনেক। কাজেই সেই লোভে একদিন একলাই চলে এলাম ফ্যাক্টরিতে। সেসময়ে আমার তৈরি একটা আয়ুর্বেদিক মণ্ড আমি ফেলতাম এই হাঁ করা পাত্রে। তা নিংড়ে এক ফোঁটা করে রস মিশত প্রতি বোতলে। ওটা মিশিয়ে পানীয়তে একটা ঝাঁঝ তৈরি করতাম আমি। সেদিনও যন্ত্রগুলো নিয়ে এ ঘরে ঢুকলাম আমি। মেশিনটাও চালু করলাম। কিন্তু মণ্ডগুলো ঢালতে যেতেই অসতর্কতার কারণে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমার হাতটা কোনওভাবে আটকে গেল পাত্রের ভেতর। আর ভেতরের কাঁটাগুলো পিষতে শুরু করল আমার হাতটাকে। এই বলে একটু কেঁপে উঠে থেমে গেলেন নীলকণ্ঠবাবু। সম্ভবত সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতিটাই তার শরীরে কাঁপন ধরাল।

তৃষিত বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'তারপর? তারপর?'

নীলকণ্ঠবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, 'কোনওরকমে হাতটাকে এই গহ্বর থেকে বার করে আমি হাসপাতালে ছুটলাম। দিনচারেক আমাকে সেখানে থাকতে হল। সাত দিন পর আবার আমি ফিরে এলাম এই ফ্যাক্টরিতে। মেশিনটা চালু থাকায় একশোর মতো বোতল তখন সিল হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো আমি পাঠিয়ে দিলাম সেই ক্যাটারারের কাছে। কয়েকদিন পর ক্যাটারার এসে জানাল যে, আরও পাঁচশো বোতালের জোগান দিতে হবে আমাকে। হেমলক খেয়ে সবাই নাকি ধন্য ধন্য করছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? একটু ভাবতেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল ব্যাপারটা। কাঁটাগুলো যখন আমার হাতটাকে পিষছিল তখন যে রক্ত বেরিয়েছিল তা এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে মিশেছিল হেমলকের বোতলে। যে পদার্থগুলো হেমলকের মধ্যে ছিল তার সঙ্গে ওই এক ফোঁটা রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়াতে হেমলকের ওই অপূর্ব স্বাদ সৃষ্টি হয়েছে...।'

তৃষিত বলে উঠল, 'কী বলছেন আপনি?'

নীলকণ্ঠবাবু শান্ত স্বরে বললেন, 'ঠিকই বলছি। হেমলকের স্বাদের গোপন রহস্য ওই এক ফোঁটা রক্ত। গল্পটা আপনি বিশ্বাস করলেন না? তবে এই দেখুন।'—এই বলে তিনি চাদরের তলা থেকে

তাঁর ডান হাতটা বার করলেন। ক্ষত-বিক্ষত সে হাতের কব্জি থেকে নীচের অংশটা নেই।

তৃষিত স্তম্ভিত, হতভম্ব!

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'এক মিলিমিটার রক্ত মানে কুড়ি ফোঁটা রক্ত। আমরা যে এক পাউচ বা এক ইউনিট রক্ত দিই তাতে পাঁচশো মিলিলিটার রক্ত থাকে। অর্থাৎ এক ইউনিট রক্ত দিয়ে এক হাজার বোতল হেমলক বানানো যায়। আমি মিথ্যা বলি না। প্রথম দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমি আপনাকে বলেছিলাম হেমলক তৈরি হয়েছে আমার রক্ত আর পরিশ্রম দিয়ে। তার আসল অর্থ সেদিন আপনি ধরতে পারেননি।

তৃষিত নিজের চোখ-কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই মজা করছেন আমার সঙ্গে? আপনি কি তবে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত এনে হেমলকের সঙ্গে মেশান?'

এ প্রশ্নের জবাবে নীলকণ্ঠবাবু যা বললেন, তাতে আরও চমকে গেল তৃষিত। নীলকণ্ঠবাবু বললেন, 'সে চেষ্টা আমি করেছিলাম। কিন্তু টাটকা গরম রক্তের ফোঁটা না হলে হেমলকের স্বাদটা ঠিক আসে না। ওই ঘটনার পর থেকে এ ফ্যাক্টরি আমি একাই চালাই। ভবঘুরে ধরনের কোনও লোক পেলে এখানে নিয়ে আসি, আর আপনার মতো কিছু অতি উৎসাহী লোকও কখনও-সখনও আমার এখানে আসেন। আর আপনারাই তো আমার হেমলকের দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল, গোপন রেসিপি। যখন পাই না প্রোডাকশন বন্ধ থাকে। একজন মানুষের শরীরে সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ লিটার রক্ত থাকে। হাজার সাত আটেক বোতল তো অনায়াসে তৈরি হয়ে যায় তা দিয়ে। প্রতি বোতলের জন্য তো মাত্র এক ফোঁটা রক্ত লাগে।'—এই বলে তৃষিতের দিকে বাম হাত তুলে ধরলেন নীলকণ্ঠবাবু। কখন যেন তাঁর হাতে উঠে এসেছে একটা পিস্তল।

তৃষিত হতভম্ব হয়ে গেল। মৃদু কাঁপা গলায় সে বলে উঠল, 'আপনি পিস্তল বার করলেন কেন?'

হিংস্র হাসি ফুটে উঠেছে নীলকণ্ঠবাবুর ঠোঁটের কোনো। হিস হিস করে চাপা স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'যাতে আপনি ফিরে গিয়ে এ গল্প কাউকে করতে না পারেন সে জন্য, যাতে আরও বেশ কয়েক হাজার হেমলকের বোতল বাজারে ছাড়া যায় সে জন্য। জানেনই তো প্রচুর চাহিদা হেমলকের।'

এরপর তিনি তৃষিতকে বললেন, 'সামনে ছোট ঘরের যে দরজাটা আছে ওর ভেতরে ঢুকে পড়ুন। আমি চেষ্টা করব মৃত্যুর আগে যতটা সম্ভব কম যন্ত্রণা দিতে আপনাকে। আপনার শরীর থেকে ধীরে ধীরে রক্ত নেব আমি। কয়েকটা লোককে তো আমি সটান এই কাঁটাওয়ালা পেষাই পাত্রের ভেতর ঠেলে ফেলেছিলাম। আমি পাঁচ গুনব অথবা গুলি চালাব। তাতে দুটো দিন আয়ু কমে যাবে আপনার।'

পাশবিক হাসি ফুটে উঠেছে নীলকণ্ঠবাবুর মুখে। তিনি ধীরে ধীরে গুনতে শুরু করলেন—'এক... দুই...।'

পিছু হটতে শুরু করল তৃষিত। কিন্তু এরপরই হঠাৎ তার মনে হল যে এই মুহূর্তে হোক আর দু'দিন পর হোক মরতে যখন তাকে হবেই এখন বাঁচার জন্য একটা শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে? আর এরপরই হঠাৎ তার খেয়াল হল জ্যাকেটের পকেটে রাখা হেমলকের বোতলটার

কথা। বাঁচার শেষ চেষ্টা স্বরূপ সেই বোতলটা মুহূর্তের মধ্যে বার করে তৃষিত সজোরে ছুড়ে মারল নীলকণ্ঠবাবুকে লক্ষ করে।

এ ঘটনা যে ঘটতে পারে তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। বোতলটা প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল তাঁর মাথায়। তার হাতের পিস্তলটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। প্রচণ্ড শব্দে একটা গুলি বেরিয়ে গেল তার থেকে। কিন্তু নীলকণ্ঠবাবু এত সহজে দমবার পাত্র নন। কাচের বোতলের আঘাতে কপাল ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে তাঁর। সেই অবস্থাতেই ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু তৃষিত ছুটে এসে ধাক্কা মারল তাঁকে। আর টাল সামলাতে না পেরে নীলকণ্ঠবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সেই হাঁড়ির মতো পেষাইযন্ত্রের ভেতরে। নীলকণ্ঠবাবু তাঁর শরীরটাকে তার ভেতর থেকে বার করে আনতে চেষ্টা করছিলেন ঠিকই কিন্তু বাইরে বেরিয়ে থাকা তাঁর শরীরের নীচের অংশের ধাক্কাতে কোনওভাবে চাপ লাগল কাঠামোর গায়ের স্যুইচটাতে। চালু হয়ে গেল পেষাই যন্ত্র। তার ধাতব কাঁটাগুলো আঁকড়ে ধরল গহ্বরের ভেতরে থাকা নীলকণ্ঠবাবুর দেহের ঊর্ধ্বাংশকে। সেই ভয়ঙ্কর পেষাই যন্ত্রের ভেতর থেকে শেষ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল নীলকণ্ঠবাবুর গলা থেকে। তারপর তৃষিতের চোখের সামনে নীলকণ্ঠবাবুর পুরো দেহটাই ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল হাঁ করা পেষাই যন্ত্রের গহ্বরে। একটা অদ্ভুত মট মট শব্দ শুধু ভেসে আসতে লাগল সেই হাঁড়ির মতো পেষাই যন্ত্রের ভেতর থেকে। সম্ভবত হাড় আর খুলি ভাঙার শব্দ।

তৃষিতের যখন সম্বিত ফিরল, ততক্ষণে কনভেয়ার বেল্টটাও চালু হয়ে গেছে। পাশের ঘর থেকে সে বহন করে আনছে হেমলকের বোতলগুলো। বোতলগুলো এসে কয়েকমুহূর্তের জন্য থামছে পেষাই যন্ত্রের নীচে। যন্ত্রের নীচের সরু ধাতব ফানেলের সূচাগ্র মুখটা মুহূর্তের জন্য বোতলের ভেতর প্রবেশ করে এক ফোঁটা করে রক্ত মিশিয়ে দিচ্ছে হেমলকের বোতলে। চুনির মতো এক ফোঁটা গাঢ় রক্ত মিশে যাচ্ছে সাদা রঙের পানীয়তে। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ বোতলগুলোর ভেতরটা। তারপর সেই বোতলগুলো কনভেয়ার বেল্ট বাহিত হয়ে কিছু দূরের ছোট যন্ত্রের ভেতর ঢুকে ছিপি এঁটে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘরের বাইরে।

তৃষিত এরপর সেখানে আর দাঁড়াল না। একবার সে বোতলগুলোর দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে টলতে টলতে সেই ঘর ছেড়ে, কারখানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে কোনওরকমে বাইকে চেপে বসল। শীতের বেলা, সূর্য ডুবে গেছে। চারপাশের খোলা মাঠ থেকে অন্ধকার আর কুয়াশা ভেসে আসছে কারখানার দিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে হারিয়ে যাবে সব কিছু। বাইক স্টার্ট করে তৃষিত রওনা হল কলকাতার দিকে। তার পিছনে পড়ে রইল হেমলকের কারখানা। তখনও হয়তো হেমলকের প্রতিটা বোতলে এক ফোঁটা করে মিশে চলেছে নীলকণ্ঠবাবুর রক্ত। হেমলকের গোপন রেসিপি। যা তৈরি করছে হেমলকের অতুলনীয় স্বাদ।

এই গল্পের সব চরিত্র, সব সংস্থার নাম ও ঘটনা কাল্পনিক।

ওরা ৪ জন

শ্যামবর্ণ মেয়েটা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'আমরা কি তবে গাছের তলায় রাত কাটাব?'

জিনস-টপ পরা তার সঙ্গিনী প্রলয়কে বলল, 'আপনাদের বুকিং স্লিপটা যে আসল তা বুঝব কী করে?'

প্রলয়ও জবাব দিল, 'আপনাদের বুকিং স্লিপটাও তো নকল হতে পারে! নইলে একই ডেটে দুটো পার্টির বুকিং কীভাবে সম্ভব?'

মেয়েটার কথার জবাব দিয়ে সে এরপর রাজর্ষিকে বলল, 'কীরে ট্রাভেল এজেন্টকে পেলি?'

রাজর্ষি সেলফোনটা কান থেকে নামিয়ে বলল, 'পাঁচবার রিং হল, কিন্তু কল রিসিভ হচ্ছে না। ডিসগাস্টিং!'

রুদ্রর মনে হল, এমনও হতে পারে যে, ট্রাভেল এজেন্সির লোকটা তার গলদটা বুঝতে পেরেছ। একই দিনে সে এই বন-বাংলো-ভূত বাংলোর বুকিংটা দুটো পার্টিকে দিয়ে ফেলেছে, তাই বেগতিক দেখে ফোন ধরছে না। সে মেয়ে দুটোর উদ্দেশে বলল, 'আপনারা আর একবার ফোন করে দেখুন তো ওই ট্রাভেল এজেন্টকে পান কিনা? তাহলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

কৃষ্ণাঙ্গী একটু অসন্তুষ্টভাবেই তার সেলফোনটা বার করে রাজর্ষির মতোই তাদের বুকিং স্লিপে লেখা কলকাতার সেই ট্রাভেল এজেন্টের নম্বর ডায়াল করল। তারপর ফোনটা কিছুক্ষণ কানে ধরে রেখে বলল, 'ওঃ শিট! কল রিসিভ করছে না।'

কেয়ারটেকার ছেলেটা কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে বিবদমান দু'পক্ষের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। স্পষ্টতই সে বুঝে উঠতে পারছে না তার কী করা উচিত। যদিও রুদ্ররা প্রথমে উপস্থিত হয়েছে, তবুও তাদের জন্য ঘর খুলতে না খুলতেই তো হাজির হল এই দু'জন ম্যাডাম। তাদের হাতে একটা ঘরের বুকিং স্লিপ, আর এই তিনজন স্যারের কাছে দুটো ঘরেরই বুকিং স্লিপ। কিচেন ছাড়া মাত্র দুটো ডাবল বেডরুম আছে এই বাংলোতে। রুদ্ররা তিনজন বলে তারা দুটো ঘরই বুক করেছে।

রুদ্র হিন্দিতে কেয়ারটেকার ছেলেটাকে বলল, 'বুকিং কিসকা হ্যায়, কোই সমাচার হ্যায় তুমহারা পাস?'

ছেলেটা ও কথার জবাবে হিন্দিতে যা বলল, তার মর্মার্থ হল, না নেই। আগাম খবর তাকে দেওয়া হয় না। যারা আসে তারা বুকিং স্লিপ নিয়ে আসে। আর তা দেখে ঘর খোলে ফাগুয়া নামের এই দেহাতি ছেলেটা। এ বাংলোটা নাকি মাত্র বছরখানেক হল ভাড়া দেওয়া শুরু হয়েছে। আর তখন থেকে এ ব্যবস্থাই চালু আছে। স্লিপ দেখালে ঘরের দরজা খুলে দেয় ফাগুয়া। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ সমস্যার মুখে সে কোনওদিন পড়েনি।

সূর্য ডুবে গিয়েছে। বেলা পড়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামবে শাল-মহুয়ার জঙ্গল ঘেরা এই ছোট্ট বন-বাংলোতে। পিচ রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রুদ্রদের জিপটা তাদের তিনজনকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে আবার আসবে কাল ভোর পাঁচটায়। সে জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে এই বাংলোতে আসতে রুদ্রদের মিনিট দশেক সময় লেগেছে। মেয়ে দুটো যে গাড়িতে এসেছে সে গাড়িও এই একই জায়গাতে তাদের নামিয়ে দিয়ে ডালটনগঞ্জ শহরের দিকে ফিরে গিয়েছে। কাল সকালের আগে তারা যে কোথাও যাবে সে উপায়ও নেই।

তবুও রুদ্র জানতে চাইল, কাছাকাছি কোনও থাকার জায়গা আছে কিনা?

ফাগুয়া জানাল থাকার জায়গা যেগুলো আছে তা সবই সাত-আট কিলোমিটার দূরে। আর ট্যুরিস্ট সিজন বলে সে সব জায়গাতেও ঘর পাওয়া যাবে না। সে সব জায়গাতে ঘর না পেয়ে আজ সকালেই নাকি দুটো ট্যুরিস্ট পার্টি এখানে এসেছিল ঘরের জন্য। তাদের কাছে বুকিং স্লিপ না থাকাতে ঘর দেয়নি ফাগুয়া।

মেয়ে দুটো তাকিয়ে আছে রুদ্রদের দিকে। কোনও একটা সিদ্ধান্ত এবার নিয়ে ফেলতে হবে রুদ্রদের। অন্ধকার নামতে চলেছে। এভাবে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। এ বাংলোতে ভূত দেখা যায়; এ কথাটা নিশ্চয়ই ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। কিন্তু ভূত না থাকলেও জঙ্গল ঘেঁষা এই জায়গাতে কোনও বন্য প্রাণী বেরিয়ে আসতে পারে। সাপ তো বেরোতেই পারে। জিপ ড্রাইভার তাদের গাড়ি থেকে নামাবার সময় সতর্ক করে বলেছিল, 'একটু সাবধানে যাবেন। ওয়াইল্ড লাইফ মাঝে মাঝে এখানেও চলে আসে। বিশেষত ভল্লুক।'

কথাটা মনে পড়াতে রুদ্র একটু ভেবে নিয়ে মেয়ে দু'জনের উদ্দেশে বলল, 'আমাদের দু-দিনের জন্য বাংলোটা বুক করা। আমরা আজকের রাতের জন্য একটা ঘর আপনাদের ছাড়তে পারি। কাল সকালে আপনাদের গাড়ি এলে কিন্তু আপনাদের অন্যত্র চলে যেতে হবে। রাজি থাকলে বলুন?'

মেয়ে দুটোর অবস্থার কথা ভেবে রুদ্রর প্রস্তাবে প্রলয় আর রাজর্ষিও সহমত প্রকাশ করে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। কলকাতা থেকে পুরো একটা দিন জার্নি করে এসে এখন বেশ ক্লান্ত লাগছে। ঘরে ঢুকে বিছানাতে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। মেয়ে দুটোর চোখে-মুখেও ক্লান্তির ছাপ। তারা বাঙালি যখন, তখন তারাও হয়তো সরাসরি কলকাতা থেকেই আসছে।

অন্ধকার নামছে। মেয়ে দুটোও সম্ভবত এবার পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করল। তাদের বুকিং স্লিপে দু-দিনের বুকিং থাকলেও তারা এবার নমনীয় হল। নিজেদের মধ্যে মৃদু দৃষ্টি বিনিময়ের পর কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটা মৃদু হেসে বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

সমস্যার সমাধান হওয়াতে হাসি ফুটে উঠল রুদ্রদের তিনজনের মুখেও। রাজর্ষি এবার মেয়ে দু'জনকে ভদ্রতাবশত প্রশ্ন করল, 'আপনারাও কি কলকাতা থেকে সরাসরি আসছেন? আপত্তি না থাকলে পরিচয়টা দেবেন?'

শ্যামবর্ণা মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, সোজা কলকাতা থেকেই। একে তো রিজারভেশন পাইনি বলে সারা ট্রেন দাঁড়িয়ে এসেছি, তারপর এখানে এসে ঘর নিয়ে এই ঝামেলা। আমার নাম কৃষ্ণকলি বসু, আর

ওর নাম রাধিকা গুপ্ত। কলকাতার একটা ল'ফার্মে একসঙ্গে চাকরি করি। আপনাদের পরিচয়টা?'

রাজর্ষি বলল, 'আমি রাজর্ষি। আমি আর এই প্রলয় কলকাতাতে কম্পিউটার পার্টসের ব্যবসা করি। আর ও হল রুদ্ররূপ। সরকারি চাকরি করে। কলেজ লাইফ থেকে আমরা বন্ধু।'

নমস্কার বিনিময়ের পর রাধিকা নামের মেয়েটা বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আপনাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছিলাম। আসলে এত ক্লান্ত যে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। আমার এখন মনে হচ্ছে ভুলটা কলকাতার ওই ট্রাভেল এজেন্সিরই—ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, ওরা আমাদের দু-পার্টিকেই একই দিনে বুকিং দিয়েছে।'

রুদ্র বলল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

ট্যুরিস্ট পার্টিদের মধ্যে ঝামেলা মিটে যাওয়াতে ইতিমধ্যে বাংলোর বারান্দায় উঠে গিয়ে দুটো ঘরই খুলে ফেলেছে ফাগুয়া।

সে ওপর থেকে বলল, 'কামরা খোল দিয়া। আইয়ে আপলোগ।'

রুদ্রদের মালপত্র ওপরে ওঠানোই ছিল। মেয়ে দুটো আসার পর ফাগুয়ার সঙ্গে তাদের তর্ক করতে দেখে তারা নীচে নেমে এসেছিল।

ফাগুয়ার কথা শুনে রাধিকা নামের মেয়েটা তার পাশে নামিয়ে রাখা সুটকেসটা তুলে নিল। তারপর সবাই এগোল বাংলোতে ওঠার জন্য।

কাঠের তৈরি বাংলোটা বেশি বড় নয়। কাঠের মেঝে, দেওয়াল। দুটো মাত্র থাকার ঘর আর তার একপাশে দুটো ছোট ঘর, স্টোর রুম আর কিচেন। আর ওদের বৃত্তাকারে ঘিরে আছে কাঠের রেলিংওয়ালা বারান্দা। ঘর আর বারান্দার মাথার ওপর টিনের ঢালু ছাদ দেওয়া। বাংলোটা দেখে বেশ পুরোনোই মনে হয়। তাই বারান্দায় উঠে আসার পর ফাগুয়ার কাছে প্রলয় জানতে চাইল, 'এ বাংলোটা কত পুরোনো?'

সে জবাব দিল, 'একশো বছরেরও পুরোনো। হিগিন্স সাহেব নামের এক সাহেব বাংলোটা বানিয়েছিলেন। তিনি শিকার খেলতে আসতেন এখানে। তখন চারপাশে বাঘের আনাগোনা ছিল। এখানকার মালিক অবশ্য একজন মাড়োয়ারি। হাজারিবাগ শহরে থাকে। বাংলোটা সারিয়ে নিয়ে রাঁচি আর কলকাতার ট্যুর এজেন্সির মাধ্যমে ভাড়া দিচ্ছে।

ফাগুয়া দুটো ঘরের মধ্যে একটা ঘর মেয়ে দু'জনকে দেখিয়ে বলল, 'আপলোগ ইস কামরেমে যাইয়ে।'

সে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ কৃষ্ণকলি নামের মেয়েটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মৃদু ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ওরে বাবা! ওটা কী!'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যরা এবার দেখতে পেল জিনিসটা। দুটো ঘরের মাঝামাঝি জায়গাতে বারান্দার সিলিং থেকে তাদের মাথার ওপর ঝুলছে বিরাট বড় একটা মৌচাক! হাজারে হাজারে মৌমাছি বিজবিজ করছে তার শরীরে। জিনিসটা দেখা মাত্রই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। মৌমাছিগুলো যদি এখন তাদের আক্রমণ করে তবে কেউ বাঁচবে না!

কিন্তু ফাগুয়া তাদের আশ্বস্ত করে বলল, 'ভয় নেই। নিশ্চিন্ত থাকুন, ওরা কাউকে কামড়ায় না। নিজেদের কাজে সারা দিন ব্যস্ত থাকে। এখানে তো ইলেকট্রিক নেই। রাতে তেলের বাতি বা মোম জ্বালালে অনেক সময় আলো দেখে দু-একটা ঘরে ঢুকে পড়ে। দরজা বন্ধ রাখবেন বাতি জ্বলার পর সমস্যা হবে না।'

তার কথা শুনে আশ্বস্ত হল সবাই। রুদ্র এবার তার সামনে দাঁড়ানো কৃষ্ণকলিকে মজা করে বলল, 'মৌমাছির হাত থেকে না হয় রেহাই পেলেন, কিন্তু ভূত যদি হানা দেয়? ভূত যে কিছু করবে না তার গ্যারান্টি কী? ট্যুর এজেন্সির বিজ্ঞাপনটা দেখেছেন নিশ্চয়?'

জবাবটা দিল রাধিকা। সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই দেখেছি। আর সেটা দেখেই তো ট্যুর এজেন্সির কাছে গিয়েছিলাম।'

ভূত দেখতেই তো আমাদের এখানে আসা। তবে ভূতের দেখা পাই, না পাই দেখুন জঙ্গলের ভেতরগুলো কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে! আর এই পুরোনো বাংলোটাও বেশ। কেমন যেন নিঝুম ভৌতিক পরিবেশ!

রুদ্র তাকিয়ে দেখল, সত্যিই বাংলোর চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় শাল-সেগুন-মহুয়া গাছগুলোর আড়ালে অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। এক অদ্ভুত ভৌতিক নিস্তব্ধতা যেন ঘিরে ধরতে শুরু করেছে এই প্রাচীন বন-বাংলোকে।

রাজর্ষি জানতে চাইল, 'বাংলোর পিছন দিকে কী আছে?'

ফাগুয়া জবাব দিল, 'জঙ্গল। তারপর ছোট একটা নদী আছে। সেটা ধরে এগোলে কিছুটা তফাতে কোয়েল নদীতে পৌঁছনো যায়।'

২

ঘরটা বেশ বড়। ডাবল বেড হলেও তাতে তিনজনে অনায়াসে শোওয়া যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অ্যাটাচড বাথ। ঘরের পিছনে বারান্দার দিকেও একটা জানলা আছে। সেটা খুলতেই বারান্দা ও তার ওপাশের অন্ধকার জঙ্গল দেখা গেল। তারা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল। কাচের চিমনি দেওয়া একটা তেলের বাতি টেবিলের ওপর রাখা ছিল। সেটা জ্বালিয়ে বাথরুমে গিয়ে একে একে ফ্রেশ হয়ে নিল তারা তিনজন। ইতিমধ্যে ফাগুয়া এসে জানিয়ে দিয়ে গেল সে মুরগির ঝোল আর রুটি পাকাচ্ছে রাতের খাবারের জন্য। আজ শুধু সে এটুকুই ব্যবস্থা করতে পারবে। পরদিন অবশ্য সাহেবরা যা খেতে চাইবে তা সে বাজার থেকে কিনে আনবে তারা তাকে পয়সা দিলে।

সে চলে যাবার পর তারা দরজা বন্ধ করে খাটে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। ব্যাগ থেকে একটা হুইস্কির বোতল বার করল রুদ্র। সঙ্গে কাজুবাদাম-চানাচুরের প্যাকেট। রুদ্রর নিয়মিত পানের অভ্যাস আছে। রাজর্ষি আর প্রলয়ের মদ্যপানে তেমন আকর্ষণ না থাকলেও, স্থান মাহাত্ম্যের কারণে তিনটে গ্লাসেই মদ ঢালা হল। 'চিয়ার্স' বলে গ্লাসে গ্লাস ঠেকাবার পর গ্লাস মুখে তুলল তারা। রুদ্র অবশ্য তার

অভ্যাসমতো এক চুমুকেই গ্লাস ফাঁকা করে দিল। অন্য দু'জন অবশ্য এক পেগের বেশি খাবে না। ধীরে ধীরে পেগটা শেষ করবে তারা। তাই মৃদু চুমুক দিয়ে গ্লাস নামাল তারা দু'জন। প্রলয় একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'জায়গাটা কিন্তু দারুণ! কেমন নির্জন, গা ছমছমে, নিস্তব্ধ!'

রুদ্র একটা বাদাম মুখে দিয়ে বলল, 'এখানে ভূত দেখা যায়—ওটা নিশ্চয়ই বাজে কথা। কিন্তু পরিবেশটা সত্যিই ঘোস্ট স্টোরির মতো!'

রাজর্ষি বলল, 'আমার কিন্তু এখানে এসে আরও একটা ব্যাপার দেখতে পেয়ে ভালো লাগল।'

'কী?' প্রশ্ন করল রুদ্র।

রাজর্ষি গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'ওই মেয়ে দুটোকে। যতই তর্ক করুক না কেন, দারুণ ফিগার। সেক্সি অ্যাপ্রোচ আছে।'

প্রলয় বলল, 'ঠিক তাই। বিশেষত রাধিকা বলে মেয়েটা ভীষণ...।

রাজর্ষি বলল, 'আমিও ব্যাপারটা খেয়াল করেছি। সত্যি দারুণ শেপ। আর ওদের নাম দুটো দারুণ। কৃষ্ণকলি আর রাধিকা। নামের মধ্যেই কেমন যেন প্রেম প্রেম গন্ধ আছে!'

তাদের কথা শুনে রুদ্র নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল, 'তোদের কি মেয়ে নিয়ে আলোচনা ছাড়া অন্য কোনও কথা নেই?'

কথাটা শুনে প্রলয় বলল, 'তুই তো শালা আর এ স্বাদ চেখে দেখলি না। শুধু মাল খেয়েই জীবন কাটাচ্ছিস। আমাদের মতো চেখে দেখলে বুঝতিস, এ নেশা মদের নেশার থেকেও বড়।'

রাজর্ষি বলল, 'হ্যাঁ, একদম ঠিক কথা।' তিনজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

নানা আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা শুরু হল এরপর। সময় এগিয়ে চলল। বাইরে অন্ধকার কেটে গিয়ে চাঁদও উঠল। চাঁদের আলোতে জানলার বাইরে পিছনের বারান্দার ওপাশে জঙ্গলটাকে যেন আরও বেশি ভৌতিক লাগছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক ভেসে আসছে সেখান থেকে।

রাত আটটা নাগাদ খাবার দিতে এল ফাগুয়া। হাতে গড়া রুটি আর শালপাতার বাটিতে ধোঁয়া ওঠা মুরগির মাংস। টেবিলের ওপর খাবার নামিয়ে রেখে ফাগুয়া বলল, 'আমি এবার গ্রামে ফিরে যাব। কাল নিশ্চয়ই আপনারা জঙ্গল সাফারিতে যাবেন। তার আগেই ফিরে আসব। চিন্তা নেই। এখানে চোর-ডাকাতের ভয় নেই। তবে রাতে বাংলো ছেড়ে বেরোবেন না। গাছে অনেক মৌচাক আছে। মধুর লোভে ভল্লুক আসে মাঝে মধ্যে।'

প্রলয় বলল, 'আর ভূতের ভয় নেই? ভূত দেখা যায় না এখানে? ট্যুর এজেন্সি তো বলছে, এখানে ভূত দেখা যায়!'

এ প্রশ্নের জবাবে ফাগুয়া জানলার বাইরে চন্দ্রালোকিত জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কখনও-সখনও যায়।'

রাজর্ষি জানতে চাইল, 'কার ভূত?'

একটু চুপ করে থেকে ফাগুয়া জবাব দিল, 'হিগিন্স সাহেবের ভূত।'

ফাগুয়ার কথা বিশ্বাস না করলেও রাজর্ষি বলল, 'সাহেবরা তো কবে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে! তা হিগিন্স সাহেবের ভূত এখনও এখানে রয়ে গেলেন কেন? তুমি নিজে তাকে দেখেছ?'

ফাগুয়া বলল, 'না, দেখিনি। স্থানীয় মানুষদের তিনি দেখা দেন না। তাঁর রাগ শহরের লোকদের ওপর। তাই তিনি এ বাংলোতে শহর থেকে লোক এলে তাদের তাড়াবার জন্য অনেক সময় দেখা দেন। অনেকেই তাঁকে দেখেছে।'

প্রলয় সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'শহরের লোকদের ওপর হিগিন্স সাহেবের রাগ কেন?'

ফাগুয়া বলল, 'হিগিন্স সাহেব ছিলেন পূর্ণিয়ার কালেক্টর। যে ক্রান্তিকারীরা হিগিন্স সাহেবকে গুলি করে মেরেছিল তারা শহর থেকেই এখানে এসেছিল। এই বাংলোতে তারা হিগিন্স সাহেবকে গুলি করে মেরে পালিয়ে যায়। তাই শহরের লোকেদের ওপর সাহেবের রাগ।'

তিন পেগ খাওয়া হয়ে গিয়েছে রুদ্রর। সে এবার সোজা হয়ে বসে তার সঙ্গীদের হেসে বলল, 'ট্যুর এজেন্সির লোকরা কিন্তু ফাগুয়াকে গল্পের ট্রেনিংটা ভালোই দিয়েছে তাই না?'

রুদ্রর কথা শুনে রাজর্ষি আর প্রলয় সম্মতি প্রকাশ করে হাসল।

রাজর্ষি ফাগুয়াকে বলল, 'তোমার গ্রাম কোথায়? কীভাবে যাবে?'

ফাগুয়া বলল, 'পাঁচ মাইল দূরে। সাইকেলে যাব।'

রুদ্র বলল, 'আচ্ছা তুমি যাও। দেখি তোমার হিগিন্স সাহেব রাতে আমাদের ভয় দেখাতে আসে কিনা!'

ফাগুয়া এবার তাদের সেলাম জানিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে গেল, ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এল। কৃষ্ণকলি আর রাধিকার ভয়ার্ত চিৎকার!

কী হল? মৌমাছির ঝাঁক ঢুকে পড়ল নাকি তাদের ঘরে? নাকি সাপখোপ অন্য কিছু?

চিৎকার শুনে রুদ্ররা খাট থেকে লাফিয়ে নেমে ফাগুয়ার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ফাগুয়া পাশের ঘরের দরজাতে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। হুড়মুড় করে সে ঘরে ঢুকল তারা চারজন। এ ঘরের ভেতরটাও ঠিক রুদ্রদের ঘরের মতোই। একই রকম তেলের বাতি জ্বলছে ঘরে। সেই আলোতে রুদ্ররা দেখল, ঘরের ঠিক মাঝখানে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণকলি আর রাধিকা। তাদের দু'জনের পরনেই নৈশ পোশাক; স্লিভলেস নাইটি। পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে তারা। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে দু'জনের মুখ! প্রলয় জানতে চাইল, 'কী হয়েছে আপনাদের?'

রাধিকা কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল, 'ভূ-উ-উ-ত!'

রুদ্র বলল, 'কোথায়?'

কৃষ্ণকলি কাঁপা কাঁপা হাতে পিছনের জানলার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে বারান্দার ওপাশে নীচের জমিতে দাঁড়িয়েছিল।'

কথাটা শুনেই তারা তিনজন গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে। বাইরে চাঁদের আলোতে বারান্দার রেলিং-এর নীচের জমিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। রাজর্ষি আর রুদ্র এরপর ঘর

থেকে বেরিয়ে পিছনের বারান্দায় গিয়ে চারপাশ ভালো করে দেখল। না, কোনও কিছুই দেখতে পেল না তারা। বারান্দা থেকে তারা ফিরে এসে আবার যখন ওদের ঘরে ঢুকল তখন আতঙ্ক পুরোপুরি না কাটলেও কৃষ্ণকলি আর রাধিকা যেন কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে বলে মনে হল রুদ্রদের। রুদ্র প্রশ্ন করল, 'আপনারা কী দেখেছেন একটু খুলে বলুন তো?'

কৃষ্ণকলি বলল, 'ফাগুয়া খাবার দিয়ে যাবার পর আমরা খাট থেকে নেমে টেবিলের দিকে যাচ্ছিলাম খেয়ে নেবার জন্য। রাধিকা জানলার বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল। তারপর আমিও বাইরে তাকিয়ে তাকে দেখলাম। নীচের জমিতে দাঁড়িয়ে দু'হাতে বারান্দার রেলিং ধরে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল সে!'

রাজর্ষি প্রশ্ন করল, 'কেমন দেখতে তাকে?'

রাধিকা আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে বলে উঠল, 'একজন সাহেব! তার সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। পরনে একটা কোট, সেই সাদা কোটটাও রক্তে লাল হয়ে আছে! জ্বলন্ত চোখে সে তাকিয়েছিল জানলার দিকে। কী ভয়ঙ্কর সেই দৃষ্টি।'

রুদ্ররা অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে। একটু আমতা আমতা করে রুদ্র বলল, 'আপনারা ঠিক দেখেছেন তো? অনেক সময় ছায়াটায়া দেখে দৃষ্টিবিভ্রম হয়।'

কৃষ্ণকলি মৃদু কাঁপাগলায় বলল, 'একদম ঠিক দেখেছি। দু'জনের কি একসঙ্গে দৃষ্টিবিভ্রম হয়!'

রাজর্ষি মন্তব্য করল, 'তাও তো বটে।'

রুদ্ররা এরপর তাকাল ফাগুয়ার দিকে। ফাগুয়া বলল, 'আপনারা শহরের মানুষ। আমার কথা বিশ্বাস করেননি। সাহেব দেখা দিয়েছিল।'

তার কথার জবাবে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না রুদ্ররা। ফাগুয়া এরপর বলল, 'আমি এবার যাচ্ছি। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হবে। রাত বাড়লে জানোয়ার বেরোয়।'—এ কথা বলে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছে তা বুঝে উঠতে পারল না রুদ্ররা। এ কীভাবে সম্ভব?

ফাগুয়া চলে যাবার পর ঘরের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কূল-কিনারা না করতে পারার পর রুদ্র একসময় কৃষ্ণকলিকে প্রশ্ন করল, 'হিগিন্স সাহেবের গল্পটা কি ফাগুয়া আপনাদের বলেছিল?'

সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলাতে বলেছিল। কিন্তু সেটা যে সত্যি আর এ বাংলোতে যে সত্যি ভূত দেখা যায়, সে কথা আমরা বিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা সত্যি জানলে কিছুতেই আমরা এখানে আসতাম না।'

তার কথা শুনে রুদ্রর মনে হল যে ফাগুয়ার বলা গল্পটাই হয়তো কোনওভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে মেয়ে দুটোর মনে। হ্যালুসিনেশন হয়েছে। কারণ, ভূতের ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কিছুতেই মন চাইছে না রুদ্রর। বন্ধু দু'জনের দিকে তাকিয়ে রুদ্রর মনে হল তাদের মনের ভাবও একই।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর রুদ্র কয়েক পা এগিয়ে জানলাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'নিন, এবার খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ুন।'

কথাটা শুনে রাধিকা বলে উঠল, 'আর আপনারা?'

রাজর্ষি রাধিকার উদ্দেশে বলল, 'আমরাও এবার আমাদের ঘরে গিয়ে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি। ভোর, পাঁচটাতে উঠতে হবে। গাড়ি আসবে। পালামৌতে জঙ্গল সাফারিতে যাব।'

কৃষ্ণকলি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না, না, আপনারা যাবেন না। সে যদি আবার আসে তখন কী হবে? দরজা-জানলা বন্ধ করে তো আর ভূতকে আটকানো যাবে না!'

রাজর্ষি তাকাল কৃষ্ণকলির দিকে।

কৃষ্ণকলির কথা শুনে রুদ্র বলল, 'তা কী করে সম্ভব? এ ভাবে রাত কাটানো যায় নাকি?'

রাধিকা বলে উঠল, 'একটা রাতের তো ব্যাপার। গল্প করতে করতেই সময় কেটে যাবে। আপনারা না থাকলে আমরা আতঙ্কে মরেই যাব। তেমন হলে আমরা আপনাদের ঘরে যাচ্ছি।'

'এদের নিয়ে মহামুশকিলে পড়া গেল তো!'—এ কথাটা মনে মনে বলে রুদ্র তাকাল তার দুই বন্ধুর দিকে। রাজর্ষি একটু ইতস্তত করে রুদ্রকে বলল, 'ওনারা যখন ভয় পাচ্ছেন তখন আমিই নয় এ ঘরে ওনাদের সঙ্গে গল্প করে কাটাই। এমনিতেই আমার নতুন জায়গাতে ঘুম আসতে চায় না।'

তার কথা শুনে প্রলয় তাকে বলল, 'তুই যদি থাকিস তবে আমিও নয় তোদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাত কাটিয়ে দেব।' প্রলয় আর রাজর্ষি যে মেয়ে দুটোর আকর্ষণে রাত জাগতে চাইছে তা রুদ্রর বুঝতে অসুবিধা হল না। তবে রুদ্রর রাত জাগার ইচ্ছা নেই। পাঁচ পেগ মদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে তার। এবার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। খাওয়া সেরে যত তাড়তাড়ি শুয়ে পড়া যায় ততই ভালো। রুদ্র তার বন্ধুদের উদ্দেশে বলল, 'তবে তোরা দু'জন থাক। খাওয়া সেরে এখানে চলে আয়।'

কৃষ্ণকলি সঙ্গে সঙ্গে রাজর্ষিকে বলল, 'আপনাদের খাবার এখানে নিয়ে আসুন না। গল্প করতে করতে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।'

রাজর্ষি রুদ্রর সঙ্গে নিজেদের ঘরে ফিরে এল তার আর প্রলয়ের খাবার পাশের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য। রুদ্র তাকে বলল, 'তোরা পারিসও বটে!'

রাজর্ষি বলল, 'তোকে বললাম না, এ নেশা বড় নেশা। তুই শালা খাওয়া সেরে এবার শুয়ে পড়।'

রুদ্র বলল, 'কাল ভোর পাঁচটাতে বেরোতে হবে খেয়াল থাকে যেন।'

রাজর্ষি তাদের খাবার নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে পড়ল রুদ্র। অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে পাশের ঘর থেকে। গল্পে মেতেছে তারা চারজন। সেই অস্পষ্ট শব্দ শুনতে শুনতে রুদ্র ঘুমিয়ে পড়ল।

৩

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল রুদ্র। সেই শব্দতেই ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙল তার। বাইরের আকাশে তখন শুকতারা মুছে গিয়ে অন্ধকার হালকা হতে শুরু করেছে। যদিও সূর্যোদয়

তখনও হয়নি। রাজর্ষি আর প্রলয় ঘরে ফেরেনি। নিশ্চয়ই তারা এখনই চলে আসবে। এ কথা ভেবে রুদ্র বাইরে বেরোবার জন্য নিজের প্রস্তুতি শুরু করল। দাঁত মেজে, বাথরুমের কাজ সেরে জামাকাপড় পরতে মিনিট পনেরো সময় লাগল। বাইরের আকাশে এবার আলো ফুটতে শুরু করেছে। দু-চারটে পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু প্রলয় আর রাজর্ষি তখনও ঘরে ঢোকেনি দেখে তাদের ডাকার জন্য বেরতে যাচ্ছিল রুদ্র। ঠিক সেই সময় তারা দু'জন ঘরে ঢুকল। তাদের দেখে রুদ্র বলল, 'নে তাড়াতাড়ি তৈরি হ। পাঁচটা বাজতে চলল।'

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে রাজর্ষি বলল, 'তুই বরং ঘুরে আয়। আমরা বাংলোতেই থাকি।'

রুদ্র বলল, 'তার মানে?'

প্রলয় বলল, 'মানে হল, আমরা জঙ্গল সাফারিতে যাব না। ওদের সঙ্গে থাকব।'

রুদ্র বলল, 'কী ফাজলামি করছিস তোরা? এত পয়সা খরচ করে বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকবি? তাছাড়া ওদের তো আজ বাংলো ছেড়ে দেবার কথা?'

প্রলয় বলল, 'না, ওরা এখানেই থাকবে আজকে রাতেও। আমরাই ওদের থাকতে বলেছি। কোথায় বা যাবে ওরা? কোথাও ঘর পাবে না।'—এই বলে সে হাসল।

রুদ্র এবার ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করতে পেরে বলল, 'তোরা কিন্তু এবার বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস! কোথা থেকে কী হয়ে যাবে শেষে বিপদে পড়বি।'

রাজর্ষি তার কথায় আমল না দিয়ে হেসে বলল, 'তুই কিছু চিন্তা করিস না। ভালো করে সারাদিন ঘুরে বেড়া। তাছাড়া দুটো ঘরই আজ সারাদিন আমাদের দরকার। একটা ঘরে তো আর দু-জোড়া নারী পুরুষ মিলে...।'

রাজর্ষির অসম্পূর্ণ বাক্যটা বুঝতে রুদ্রর অসুবিধা হল না। বিস্মিতভাবে রুদ্র বলে উঠল, 'তবে তোরা সত্যিই যাবি না?' প্রলয় বলল, 'না, যাব না। ওরাও রাজি। জীবন তো সবাই উপভোগ করতে চায়। আমরা যাব না।'—এ কথা বলে রুদ্রকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তারা।

রুদ্র খাটের উপর বসে পড়ল। এত দিনের চেনা দুই বন্ধুকে হঠাৎই যেন খুব অচেনা মনে হল তার। মনটা কেমন যেন তেতো হয়ে গেল রুদ্রর। বাইরে এবার ভালো করে আলো ফুটতে শুরু করেছে। পাখির ডাকও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সেদিকে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রুদ্রর একসময় মনে হল, না, এই সুন্দর সকালে এভাবে মন খারাপ করার কোনও মানেই হয় না। রাজর্ষি আর প্রলয় তাদের যা ইচ্ছা করুক, সে এখানে ঘুরতে এসেছে, ঘুরে বেড়াবে তার নিজের মতো। ঠিক পাঁচটাতে ফাগুয়া চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। রুদ্রদের ভোরবেলা বেরবার কথা বলে সে আগেই চলে এসেছে। কোনও মতে চা শেষ করে ক্যামেরা আর কিট ব্যাগ নিয়ে ঘরের বাইরে বেরোল সে। পাশের ঘরের দরজা খোলা। মেয়েগুলির সঙ্গে রাজর্ষিদের কথার শব্দ ভেসে আসছে। সেদিকে একবারও না তাকিয়ে ঘরটা দ্রুত অতিক্রম করে বারান্দা থেকে নীচে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রুদ্র রওনা হল পিচ রাস্তার দিকে।

কথামতোই রুদ্রদের জন্য জিপটা অপেক্ষা করছিল সেখানে। অন্য দু'জন যাবে না, এ কথাটা ড্রাইভারকে জানিয়ে দিয়ে রুদ্র একাই রওনা হয়ে গেল জঙ্গল সাফারির জন্য।

সারাটা দিন অদ্ভুত সুন্দরভাবে কেটে গেল রুদ্রর। প্রথমে পালামৌয়ের জঙ্গলে জিপ সাফারি। বেতলা টাইগার রিজার্ভের একটা অংশ হল পালামৌয়ের জঙ্গল। বাঘ দেখতে না পেলেও প্রচুর হরিণ, বন্য বরা আর পাখি দেখল সে। তাছাড়া জঙ্গলে বেড়াবার আলাদা রোমাঞ্চ তো আছেই। জঙ্গল আর কোয়েল নদী দেখার পর প্রাচীন পালামৌ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এসব দেখতে দেখতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে ডালটনগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাবার কথা। ড্রাইভার জানাল সে এখন আর ডালটনগঞ্জ ফিরবে না। রাতটা সে গাড়িতে কাটিয়ে পরদিন ভোরে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে ফিরবে। গাড়ি থেকে নেমে রুদ্র এগোল বন-বাংলোর দিকে। রুদ্র যখন বন-বাংলোর সামনে পৌঁছল ঠিক তখনই অন্ধকার নামতে শুরু করল।

বারান্দাতে উঠে এল রুদ্র। মেয়েগুলির ঘরের দরজা বন্ধ হলেও তার ঘরের দরজা খোলা। সে ঘরে প্রবেশ করে রুদ্র দেখল তার ঘরের চাদর ঠিক করছে ফাগুয়া। অর্থাৎ রুদ্রর অবর্তমানে এ ঘরে কেউ বা কারা শুয়েছিল। টেবিলের উপর এরপর একটা চুলের ক্লিপও নজরে পড়ল। নিশ্চয়ই সেটা রাধিকা বা কৃষ্ণকলির হবে। রুদ্র জানতে চাইল, 'বাবুরা বাইরে বেরিয়েছিলেন? ম্যাডামরা কি চলে গেছেন?

ফাগুয়া জবাব দিল, 'না, বেরোননি, তারা ঘরেই ছিলেন। ম্যাডামরাও আছেন।'

ফাগুয়া চলে যাবার পর ফ্রেশ হয়ে বাতিটা জ্বালিয়ে খাটে বসল রুদ্র। এবার দুই বন্ধুর প্রতি একটা তীব্র অভিমান জমা হতে শুরু করল রুদ্রর মনে। মেয়ে দুটোর প্রতি রাজর্ষি আর প্রলয় এত আসক্ত হয়ে পড়ল যে, তার কথা তাদের খেয়ালই পড়ছে না!

বেশ কিছুক্ষণ একলা বসে থাকার পর ওয়ার্ডরোব খুলে মদের বোতল বার করল রুদ্র মদ্যপান শুরু করবে বলে। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল প্রলয় আর রাজর্ষি।

প্রলয় তাকে জিগ্যেস করল, 'কী রে কখন ফিরলি?'

অভিমানী কণ্ঠে রুদ্র জবাব দিল, 'তা জেনে তোরা কী করবি? তোরা যা করছিস সেটা কর।'

রাজর্ষি বলল, 'আহা রাগ করছিস কেন? সারাদিন কেমন বেড়ালি বল?

রুদ্র বলল, 'বললাম তো ওসব জেনে তোদের দরকার কী? এই তোদের সঙ্গে আমার শেষ বেড়াতে আসা। তোদের নিশ্চয় ভালো কেটেছে?

প্রলয় বলল, 'হ্যাঁ, দারুণ। সত্যি কথা বলতে কী, সম্ভব হলে আরও ক'দিন এখানে থেকে যেতাম।' এই বলে সে এগিয়ে এসে হাত রাখল বন্ধুর কাঁধে।

রুদ্র এক ঝটকায় প্রলয়ের হাতটা তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলতে যাচ্ছিল, 'ও ঘরে যা। দরকার হলে বল আমি এ ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছি!' কিন্তু ঠিক সেই সময় সে দেখতে পেল দরজার সামনে রাধিকা আর কৃষ্ণকলি এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরের লোকের সামনে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা উচিত নয় বলে কথাগুলি বলতে গিয়েও থেমে গেল রুদ্র।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাধিকা বলল, 'আসুন না, চাঁদ ওঠা পর্যন্ত আমরা সবাই আমাদের ঘরে বসে গল্প করি...'

কথাটা শুনে প্রলয় রুদ্রকে বলল, 'হ্যাঁ, রুদ্র ওঘরে চ। সবাই মিলে ওঘরে আড্ডা দিই।'

রুদ্র জবাব দিল, 'না, তোরা যা। আমি এ ঘরেই থাকি।'

প্রলয় বলল, 'চল রুদ্র। আর রাগ করিস না।'

রুদ্র বলল, 'বলছি তো ভলো লাগছে না। তাছাড়া আমি এখন পান করব।'

রাধিকা বলল, 'সেটা আপনি আমাদের ঘরে গিয়েও করতে পারেন। কোনও আপত্তি নেই।'

রুদ্র কথার কোনও জবাব দিল না।

কৃষ্ণকলি এবার বলল, 'রুদ্রবাবু প্লিজ আসুন না। নইলে বুঝব আপনি আমাদের অপছন্দ করছেন।' ব্যাপারটা ঠিক হলেও মেয়েটার কথা শুনে অস্বস্তিতে পড়ে গেল রুদ্র। তাদের মুখের ওপর তো বলা যায় না, 'ঠিক বলছেন।'

রাজর্ষি রুদ্রর হাত থেকে মদের বোতল আর গ্লাসটা টেনে নিয়ে বলল, 'আর কোনও কথা বলব না। চল ওঘরে গিয়ে খাবি।' এই বলে সে দরজার বাইরে পা বাড়াল। অগত্যা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই রুদ্র সবার পিছন পিছন গিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কৃষ্ণকলি রুদ্রর উদ্দেশে বলল, 'কোনও সংকোচ করবেন না। আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে আপনি মদ্যপান চালিয়ে যান।'

রাজর্ষি মদের বোতল আর গ্লাসটা সে ঘরের টেবিলে রাখল। তারপর খাটে বসল। অন্যরাও খাটে বসল। আর রুদ্র গিয়ে বসল টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে। জলের বোতলও রাখা ছিল টেবিলে। পেগ বানিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল রুদ্র।

তার পেগটা শেষ হবার পর রাজর্ষি তাকে বলল, 'এবার নিশ্চয়ই তোর মাথা একটু ঠান্ডা হয়েছে? সারাদিন কী দেখলি বল?'

রুদ্র জবাব দিল 'পালামৌ ফরেস্ট, তারপর পালামৌ ফোর্ট আর ফেরার পথে ডালটনগঞ্জ।

কৃষ্ণকলি প্রশ্ন করল, 'আপনি কোয়েল নদী দেখেছেন?'

রুদ্র বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। বেশ জলও আছে নদীতে।'

রাজর্ষি রুদ্রকে বলল, 'আমরাও কোয়েল নদী দেখতে যাব।'

রুদ্র গ্লাসে মদ ঢেলে দ্বিতীয় পেগটা বানিয়ে নিয়ে বলল, 'কাল ভোরে কিন্তু আমাদের বেরোবার কথা। সকাল আটটাতে ডালটনগঞ্জ থেকে ফেরার ট্রেন। কীভাবে নদী দেখতে যাবি?'

রাধিকা বলল, 'কাল নয় আজ।'

রুদ্র বলল, 'তার মানে?'

প্রলয় জানলার বাইরে বন-বাংলোর পিছনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছুটা এগোলেই একটা ছোট নদী আছে। আর তার পাড় বরাবর কিছুটা এগোলেই কোয়েল নদী। কাল এখানে আসার পর ফাগুয়া বলেছিল তোর মনে নেই। ভালো করে চাঁদ উঠলে আমরা সবাই সেখানে যাব।'

গ্লাসটা গলায় ঢেলে দিয়ে রুদ্র বিস্মিতভাবে বলল, 'এত রাতে ওখানে যাবি?'

কৃষ্ণকলি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, রাতেই যাব। চাঁদনি রাতে অপূর্ব লাগে কোয়েল নদী। দু'পাশে জঙ্গল আর তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কোয়েল নদী। চাঁদ এসে ধরা দেয় নদীর জলে।'

রুদ্র বলল, 'কিন্তু অত রাতে সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে? যদি কোনও বন্য প্রাণী...।'

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজর্ষি বলল, 'আমরা একসঙ্গে এতজন লোক। বন্যপ্রাণী কাছে ঘেঁষবে না। তাছাড়া ওই দেখ, ফাগুয়ার থেকে কয়েকটা লাঠি আনিয়ে রেখেছি।'—এই বলে সে ঘরের কোণায় রাখা গাছের কয়েকটা শুকনো শক্ত ডাল ইশারায় দেখাল রুদ্রকে।

প্রলয় বলল, 'তুই আমাদের সঙ্গে যাবি তো রুদ্র?'

রুদ্র জবাব দিল, 'না, আমি যাব না, তোরা ঘুরে আয়।'

তার কথা শুনে সবাই মনে হয় খুশিই হল। কারণ দু'জোড়া যুবক যুবতীর এই অভিসারে রুদ্র অডম্যান।

তবুও ভদ্রতার কারণেই হয়তো প্রলয় আবারও বলল, 'কেন যাবি না? চল।'

রুদ্র পাশ কাটাবার জন্য বলল, 'বললাম তো আমি যাব না। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে খুব ক্লান্ত লাগছে। কাল সকালেই তো আবার ফেরার জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে।'

কথাটা শুনে কৃষ্ণকলি বলল, 'উনি যখন ক্লান্ত, তখন আর ওনাকে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। আমরা চারজনই ঘুরে আসব।'

এ কথার পর আর রুদ্রকে কেউ যাবার জন্য চাপাচাপি করল না। নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করল তারা চারজন। আর ঘরের কোণে বসে মদ্যপান করতে লাগল রুদ্র। ঘণ্টাখানেক বাদে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ঘরের কোণ থেকে লাঠিগুলি তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে, বন-বাংলো ছেড়ে পিছনের জঙ্গল দিয়ে নদীর দিকে রওনা হয়ে গেল তারা চারজন। সে ঘরেই বসে রইল রুদ্র। সময় এগিয়ে চলল।

৪

নিজের জায়গাতেই বসেছিল রুদ্র। ইতিমধ্যে আরও কয়েক পেগ হুইস্কি খেয়েছে সে। নেশাটা বেশ চড়েছে। একটা শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল। ফাগুয়া ঘরে ঢুকেছে। রুদ্র তার দিকে তাকাতেই সে বলল 'আটটা বাজে। সাহেবরা কখন ফিরবে জানেন? আপনাদের খাবার দিয়ে আমাকে ফিরতে হবে।'

রুদ্র জবাব দিল, 'না, আমি জানি না।'

ফাগুয়া তার জবাব শুনে আর কোনও কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফাগুয়া চলে গেলেও সে একটা শঙ্কার বীজ বুনে দিয়ে গেল রুদ্রর মনে। রাতের বেলাতে জঙ্গল ভেঙে নদী দেখতে যাওয়া কি তাদের ঠিক হল? কোনওরকম বিপদ-আপদ যদি ঘটে? উৎকণ্ঠা তৈরি হতে শুরু করল রুদ্রর মনে।

ফাগুয়া চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে ঈষৎ টলোমলো পায়ে রুদ্র ঘর দুটোকে বেড় দিয়ে উপস্থিত হল বারান্দার পিছনের অংশে। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। ফটফটে আলো ছড়িয়ে পড়েছে সামনের এক ফালি ফাঁকা জমিতে আর তাকে ঘিরে থাকা গাছগুলোর মাথায়। একটা কালো পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে গাছগুলোর মাথার ওপর। বাদুড়ও হতে পারে। ওই গাছের প্রাচীরের আড়ালেই তো নাকি সেই নদীটা। যেটা গিয়ে মিশেছে কোয়েল নদীর সঙ্গে। বারান্দার কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রাজর্ষিদের ফেরার প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। সময় এগিয়ে চলল।

'রুদ্রবাবু?'—নারী কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে রুদ্র পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেল তার কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণকলি আর রাধিকা! রুদ্র তো সামনের দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবে কি ঘুরপথে বন-বাংলোতে ফিরে এসেছে সবাই? মেয়ে দু'জন সদ্য ফিরেছে বলেই মনে হয়, এখনও তাদের দু'জনেরই হাতে গাছের ডাল বা লাঠি ধরা।

রুদ্র তাদের প্রশ্ন করল, 'আপনারা কখন ফিরলেন? রাজর্ষি আর প্রলয় ঘরে ঢুকেছে?'

কৃষ্ণকলি জবাব দিল, 'আমরা আপনাকে ডাকতে এলাম। তারা দু'জন এখনও নদীর পাড়েই আছে। আপনাকে তারা সেখানে যেতে বলেছে। একটা বিশেষ জিনিস আপনাকে ওরা দেখাবে।'

রুদ্র বেশ অবাক হয়ে গেল তাদের কথা শুনে। বিস্মিতভাবে সে বলল 'আমাকে নদীর পাড়ে ডেকে পাঠিয়েছে! কী জিনিস দেখাবে?'

রাধিকা হেসে বলল, 'সেটা ওখানে গেলেই জানতে পারবেন। ওই তো ওই জঙ্গলটার পিছনেই নদীর পাড়। মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে যেতে। তারপর সবাই আবার একসঙ্গে ফিরে আসব।'

রুদ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাধিকা আর কৃষ্ণকলি এগিয়ে এল রুদ্রর কাছে। রাধিকা রুদ্রর সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'প্লিজ চলুন না। ওরা তো অপেক্ষা করছে।'

চাঁদের আলো এসে পড়েছে রাধিকার শরীরে। কয়েকমুহূর্তের জন্য রুদ্রর চোখ আটকে গেল সেদিকে। আর সেটা বুঝতে পেরেই রাধিকা মনে হয় হাসল। এর পরক্ষণেই অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে রুদ্র রাধিকার শরীর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকাল। ঠিক সেই সময় রেলিং-এর ঠিক নীচে একটা শব্দ হল। সেটা শুনে রুদ্ররা নীচে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। রেলিং-এর নীচে কয়েক হাত তফাতে এসে দাঁড়িয়েছে একজন। এক সাহেব। তার পরনে কোট, মাথায় হ্যাট। সারা শরীর বেয়ে তার রক্ত ঝরছে! মুখ, কোট সব রক্তে মাখামাখি। জ্বলন্ত চোখে সে চেয়ে আছে বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনের দিকে। কী হিংস্র দৃষ্টি! মুহূর্তের মধ্যে যেন নেশার ঘোর কেটে গেল রুদ্রর। আর এর পরেই একসঙ্গে আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল কৃষ্ণকলি আর রাধিকা। একটা চিৎকার বেরিয়ে এল হিগিন্স সাহেবের কণ্ঠ থেকেও। চিৎকার করে সেই প্রেতাত্মা ছুটতে শুরু করল নীচের জমি দিয়ে বাড়ির সামনের অংশের দিকে যাওয়ার জন্য। আর তাই দেখে হঠাৎই রুদ্রর মনে হল 'সে যদি হিগিন্স সাহেবের প্রেতাত্মা হয়ে থাকে তবে ওভাবে পালাচ্ছে কেন? আর কেনই বা সে পালাবে?'

নেশার ঘোর কেটে গেছে রুদ্রর। তার মনে এবার অন্য একটা প্রশ্নচিহ্ন উঁকি দিল। বারান্দার পিছনের অংশ থেকে ছুটে সে সামনের অংশে চলে এল। হিগিন্স সাহেবের ভূত তখন বাংলোর সামনের ফাঁকা জমিটা টপকে জঙ্গলের দিকে এগোচ্ছে, হয়তো বা জঙ্গল অতিক্রম করে বড় রাস্তাতে যাওয়ার জন্য। কে ও? সত্যি প্রেতাত্মা নাকি অন্য কেউ? শেষ দেখতে হবে ব্যাপারটার। এই ভেবে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে রুদ্রও ছুটল লোকটার পিছনে। আর তার পিছন পিছন লাঠি হাতে ছুটল কৃষ্ণকলি আর রাধিকাও। চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে কিচেন ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে ফাগুয়া ব্যাপারটা দেখতে পেল। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাটা অনুমান করে নিয়ে ফাগুয়াও বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে পশ্চাদ্ধাবন করল তাদের।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লোকটার পিছনে ছুটছে সবাই। রুদ্রর সঙ্গে ক্রমশই ব্যবধান কমে আসছে হিগিন্স সাহেবের প্রেতাত্মার। জঙ্গলের বাইরে বেরোবার ঠিক মুখটাতে পৌঁছে লোকটাকে প্রায় ধরে ফেলল রুদ্র। তার পিছন পিছন ছুটে আসছে মেয়ে দুটো। ফাগুয়াকে অবশ্য খেয়াল করেনি রুদ্র। রুদ্র তাকে ধরে ফেলবে বুঝতে পেরেই হয়তো শেষ একবার তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে পালাবার জন্য পিছনে ফিরে দাঁড়াল সেই প্রেতাত্মা। কিন্তু কাজটা সে করতে পারল না। রুদ্রর পিছন পিছন ছুটে আসা কৃষ্ণকলিদের দেখে সে যেন প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে মাটির ওপর পড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই হুড়মুড় করে সেখানে এসে পড়ল রাধিকা আর কৃষ্ণকলি। চিৎকার করে তারা বলে উঠল, 'মেরে ফেলতে হবে, মেরে ফেলতে হবে হিগিন্স সাহেবের ওই ভূতটাকে!'—একথা বলে তারা দু'জন হিংস্র চিৎকার করতে করতে লাঠি চালাতে লাগল ভূপতিত হিগিন্স সাহেবের দেহের ওপর। রুদ্র বুঝে উঠতে পারছে না তার কী করা উচিত। আর এরপরই সেখানে এসে উপস্থিত হল ফাগুয়া। সে কৃষ্ণকলি আর রাধিকার উদ্দেশে বলে উঠল 'ওকে মারবেন না, মারবেন না। ও হল বিরজু। আমাদের সাজানো লোক। ভূত সেজে ট্যুরিস্টদের ভয় দেখায়।'

কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করল না মেয়ে দুটো। পাগলের মতো লাঠি চালাতে চালাতে তারা চিৎকার করে উঠল, 'খুন করব। খুন করব ওকে।'

'লোকটা এবার মরে যাবে। থামুন থামুন!' বলে ফাগুয়া এরপর রাধিকার হাতের লাঠিটা ধরতে গেল। কিন্তু কাজটা সে করতে পারল না। সে রাধিকার হাতটা ধরতে যেতেই কৃষ্ণকলি প্রচণ্ড জোরে তার হাতের লাঠিটা চালিয়ে দিল ফাগুয়ার মাথায়। তার আঘাতে ফাগুয়া ছিটকে পড়ে স্থির হয়ে গেল। বোধহয় সেও জ্ঞান হারাল।

রুদ্র হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কিছুটা তফাতে দু'পাশে পড়ে আছে হিগিন্স সাহেবের প্রেতাত্মা আর ফাগুয়া। আর রুদ্রর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাধিকা আর কৃষ্ণকলি। চাঁদের আলোতে কেমন যেন জান্তব হিংস্রতা ফুটে উঠেছে তাদের মুখে। রাধিকা একবার তাকিয়ে নিল মাটিতে পড়ে থাকা দুটো দেহর দিকে। তারপর হাতের লাঠিটা একটু তুলে ধরে বলল, 'যাক, এবার আর ওরা আমাদের বাধা দিতে পারবে না।'

কৃষ্ণকলি এবার রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো এবার। তোমার বন্ধুরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

রুদ্র বলল, 'এভাবে এ দু'জনকে ফেলে রেখে কোথায় যাব?'

রাধিকা এসে রুদ্রর একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'কোয়েল নদীতে। যেখানে রাজর্ষি আর প্রলয় রয়েছে।'

রুদ্র বলে উঠল, 'না, আমি যাব না। এদের এভাবে মারাটা ঠিক হয়নি।'

কৃষ্ণকলি এগিয়ে এসে রুদ্রর অন্য হাতটা চেপে ধরে হিসহিস করে বলল, 'যেতে তোমাকে হবেই। তোমার বন্ধুরা যে তোমাকে ডাকছে...।

দুটো কঠিন হাত চেপে বসেছে রুদ্রর দু-হাতের কব্জির ওপর। কী হিমশীতল সেই স্পর্শ। হাত দুটো তাকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে কোয়েল নদীর পথে।

রুদ্র শেষ একটা চেষ্টা করল, হাত দুটো ছাড়াবার জন্য। প্রচণ্ড একটা ঝটকায় হাত দুটো তাদের হাত থেকে খসিয়ে নিল সে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে উঠল কৃষ্ণকলি আর রাধিকার চোখ। রুদ্রর প্রতি একরাশ ঘৃণা, আক্রোশ যেন ফুটে উঠল। কৃষ্ণকলির ঠোঁটের কোণে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'তবে তোমাকে অন্যভাবে আমাদের সঙ্গী করি, যেমন আমাদের সঙ্গী হয়েছে তোমার বন্ধুরা।'

এই বলে সে তার হাতে ধরা মোটা লাঠিটা চালাল রুদ্রর মাথা লক্ষ করে। ব্যাপারটা অনুমান করে রুদ্র মাথাটা সরিয়ে নিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল 'তোমরা কি পাগল হয়ে গিয়েছ!'

এক চুলের জন্য লাঠির মারাত্মক আঘাত থেকে নিজের মাথাকে বাঁচাল সে।

তার কথার কোনও জবাব দিল না তারা। রুদ্রর দু'পাশ থেকে কৃষ্ণকলি আর রাধিকা তাদের লাঠি দুটো ধীরে ধীরে তুলতে শুরু করল, মোক্ষম আঘাত হানার জন্য।

আঘাত হানতে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে কয়েকটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল তাদের ওপর। রাস্তার দিক থেকে কয়েকজন লোক ঢুকছে। টর্চের আলো তাদেরই। থেমে গেল রাধিকা-কৃষ্ণকলি। আলোগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। শেষবারের জন্য একবার তারা তাকাল রুদ্রর দিকে। তাদের চোখে রুদ্রর প্রতি তীব্র ঘৃণা আর হিংস্রতা ফুটে উঠল শেষবারের জন্য। সে দৃষ্টি যেন কাঁপন ধরিয়ে দিল রুদ্রর বুকে। আর তারপরই রাধিকা আর কৃষ্ণকলি অদৃশ্য হয়ে গেল বন-বাংলোর দিকে। হয়তো তারা রওনা হল বাংলোর পিছনের রাস্তা দিয়ে নদীর পাড় বরাবর কোয়েল নদীর দিকে। আর এরপরই টর্চের আলো এসে ঘিরে ধরল রুদ্রকে।

পুলিশ। তাদের সঙ্গে রুদ্রদের জিপের ড্রাইভারও আছে। নৈশ প্রহরাতে বেরিয়েছিল পুলিশের পেট্রলিং কার। চিৎকারের শব্দ শুনে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এসেছে তারা। একজন পুলিশ অফিসার আর চারজন কনস্টেবল।

অফিসার হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকা রুদ্রকে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে?'

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে রুদ্র সংক্ষেপে ব্যক্ত করল ঘটনাটা।

অফিসার শুনে বিস্মিত হয়ে দু'জন পুলিশকর্মীকে নির্দেশ দিল বাংলোর দিকে যেতে এবং নদীর পাড় থেকে মেয়ে দু'জন আর রাজর্ষিদের ডেকে আনতে। নির্দেশ পেয়ে সেদিকে এগোল দু'জন কনস্টেবল।

আর এরপরই একজন পুলিশকর্মী মাটিতে পড়ে থাকা হিগিন্স সাহেবের প্রেতাত্মার মুখের ওপর আলো ফেলে বলে উঠল, 'আরে! এ যে আমাদের বিরজু ডোম।'

অফিসারও বিস্মিতভাবে বলে উঠল 'হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু ও এ পোশাকে কেন?'

আঘাত সামলে ফাগুয়া তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রণা মিশ্রিত গলায় সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ সার ও বিরজু। হিগিন্স সাহেবের ভূত সেজে ট্যুরিস্টদের দেখা দেয়। ট্যুরিস্ট টানার জন্য আমরা ওকে দিয়ে হিগিন্স সাহেবের ভূত দেখাই।'

অফিসারদের সঙ্গী দু'জন পুলিশকর্মী এবার লেগে পড়ল বিরজু বলে লোকটার জ্ঞান ফেরাবার কাজে। রুদ্রদের ড্রাইভার ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে জল নিয়ে এল। আর অফিসার আরও একবার ফাগুয়ার থেকে জেনে নিলেন ঘটনাটা। ফাগুয়ার বয়ান মিলে গেল রুদ্রর বলা কথার সঙ্গে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জলের ঝাপটাতে উঠে বসল বিরজু নামের লোকটা। অফিসার তাকে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছিল?'

আতঙ্কিতভাবে চারপাশের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বিরজু বলে উঠল, 'ওরা বেঁচে উঠেছে সাহেব। আমাকে ওরা খুন করতে চেয়েছিল।'

অফিসার বললেন, 'কারা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল?'

বিরজু বলে উঠল, 'ওই যে গতকাল যে মেয়ে দুটোর লাশ নদী থেকে তুলে আপনার সঙ্গে গিয়ে মর্গে রেখে এসেছিলাম।'

কথাটা শুনে অফিসার বিরজুকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কী যা তা বলছ? ক-গ্লাস মদ খেয়েছ আজ? এখনও নেশা কাটেনি?'

বিরজু বলে উঠল, 'আমি সত্যি বলছি হুজুর। গতকাল আমি যখন ভূত সেজে এসেছিলাম তখন মেয়ে দুটো ঘরের মধ্যে থাকায় আমি ওদের চিনতে পারিনি।

আজ ওরা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। আমি ওদের দেখেই চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলাম। ওরাও আমাকে দেখে চিনতে পেরে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। আর তারপর...।'

কথা শেষ না করে আতঙ্কিত বিরজু বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেল। রুদ্র এবার নিজেকে সামলে নিয়ে অফিসারকে বলল, 'এই বিরজু কাদের কথা বলছে?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আপনি জানেন নিশ্চয়ই এই ফরেস্ট বাংলোর পিছনে একটা ছোট নদী আছে। সেটা গিয়ে মিশেছে কোয়েল নদীর সঙ্গে। গতকাল সেখান থেকে সকালবেলাতে আমরা দুটো মেয়ের লাশ উদ্ধার করেছি। মনে হয় ট্যুরিস্ট। তবে তখনও তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

আসলে ও জায়গাটা খুব সুন্দর হলেও প্রচণ্ড চোরাস্রোত আছে। ভুল করে হাঁটু জলে নামলেই আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে। পাথরে বাড়ি খেতে খেতে জলে ডুবে মারা পড়বেন আপনি। লাশ অবশ্য

বেশি দূরে যায় না। কিছুটা এগিয়ে বাঁকের মুখে পাথরের বোল্ডারের খাঁজে আটকে থাকে। মেয়ে দুটোর লাশও ওখান থেকেই পাওয়া গিয়েছে। ওদের কথাই বলছে বিরজু। কাল দুপুরে বডি দুটোর পোস্টমর্টেমও হয়ে গিয়েছে।'

কথাটা শুনে রুদ্র বলে উঠল, 'তা কী করে সম্ভব? তাছাড়া ওরা তো কাল সন্ধ্যা থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিল। ওদের নাম কৃষ্ণকলি আর রাধিকা।'

পুলিশ অফিসার রুদ্রর কথার কোনও জবাব দিলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে তিনিও সম্ভবত মনে মনে ভাবতে লাগলেন বিরজুর কথাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা?

প্রায় আধঘণ্টা পরে যে দু'জন কনস্টেবল চারজনকে খুঁজতে গিয়েছিল তারা এসে জানাল, 'বন-বাংলো বা কোয়েল নদীর কাছে তারা কোথাও তাদের কাউকে খুঁজে পায়নি।'

পুলিশ অফিসার প্রথমে সদ্য উঠে দাঁড়ানো বিরজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল সকালে দশটার আগে তো মর্গ খুলবে না। নইলে এখনই গিয়ে দেখে আসতাম সেখানে লাশ দুটো আছে কিনা? যদি তোমার কথা মিথ্যে বলে ধরা পড়ে তবে এমন মার মারব যে আর কোনওদিন নেশা করে পুলিশকে মিথ্যা বলবে না।'

তার কথা শুনে বিরজু আবারও বলে উঠল, 'আমি সত্যি বলছি হুজুর। আমি নিজের হাতে লাশ দুটো টেনে তুলেছি আর চিনতে পারব না।'

অফিসার এরপর রুদ্রকে বললেন, 'আপনি এবার আমার সঙ্গে থানায় চলুন। রাতটা আপাতত আমার ওখানেই কাটান। এখানে থাকলে আবার কী ঘটবে কে জানে?'

রুদ্র বলল, 'কিন্তু আমার বন্ধু রাজর্ষি আর প্রলয় কোথায় গেল?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আজ এত রাতে আর তাদের খোঁজ করা যাবে না। কাল ভোরেই তাঁদের খোঁজে লোক পাঠাব। হয়তো এখানেই কোথাও আছেন তারা। আপাতত আপনি থানায় চলুন।'

রুদ্র এরপর অফিসারের সঙ্গে রাস্তায় এসে চড়ে বসল পুলিশের গাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই থানায় এসে পৌঁছে গেল তারা। থানাতেই একটা ফাঁকা ঘরে রুদ্রর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল। রাজর্ষি আর প্রলয়ের কথা ভেবে ভেবে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় সারা রাত জেগে কাটাল রুদ্র। ভোরের আলো ফুটতেই অফিসার তার পুলিশকর্মীদের পাঠিয়ে দিলেন রাজর্ষি আর প্রলয়ের খোঁজে, আর সেই দু'জন মেয়ের খোঁজেও। যারা বন-বাংলোতে ছিল রুদ্রদের সঙ্গে।

৫

থানার সেই ঘরটাতেই চুপচাপ বসেছিল রুদ্র। সকাল ন'টা নাগাদ সেই পুলিশ অফিসার প্রবেশ করলেন সে ঘরে। তার চোখেমুখে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব। এই সকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্র প্রশ্ন করল 'ওদের খোঁজ মিলেছে?'

অফিসার জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ওই কোয়েল নদীতেই। কিন্তু এ কীভাবে সম্ভব?'

এ কথা বলার পর একটু থেমে তিনি বললেন, 'আপনি একবার বাইরে আসুন।'

ঘর থেকে বেরোল রুদ্র। থানার সামনের ছোট চত্বরটার মাঝখানে গোল করে একটা জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কিছু পুলিশকর্মী। অফিসারের সঙ্গে রুদ্র গিয়ে উপস্থিত হল সে জায়গাতে। পুলিশকর্মীদের ঘেরা জায়গাটার মাঝখানে পরপর চারটে লাশ শোয়ানো আছে কাপড় ঢাকা দিয়ে। চারটে লাশই একই সঙ্গে তুলে আনা হয়েছে কোয়েল নদী থেকে। পুলিশ অফিসারের ইশারায় একজন পুলিশকর্মী প্রথমে দুটো লাশের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নিল।

রুদ্র আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'এরাই আমার বন্ধু রাজর্ষি আর প্রলয়। কীভাবে এ ঘটনা ঘটল?'

অফিসার বললেন, 'জলে ডুবে। সম্ভবত কাল রাতের ঘটনা। টাটকা লাশ। পচন ধরেনি এখনও।'

এ কথা বলার পর পুলিশ অফিসারও যেন একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'দেখুন তো অন্য দু'জনকে চিনতে পারেন কিনা?'

অন্য দুটো লাশের ওপর থেকে কাপড় সরে যেতেই রুদ্র দেখতে পেল দুটো নগ্ন নারীদেহ। ফুলে ওঠা দু-তিনদিনের পুরোনো দুটো লাশ। তাদের বুক থেকে পেট পর্যন্ত চেরা পোস্টমর্টেমের দাগ।

দিনের আলোতেও মুহূর্তের জন্য রুদ্রর চোখে ভেসে উঠল গত রাতের সেই দৃশ্য! তার দুটো হাত দু'পাশ থেকে শক্ত করে ধরে তার বন্ধুদের কাছে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কৃষ্ণকলি আর রাধিকা। নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছে তাদের ঠোঁটে। লোকজন এসে না পড়লে এখন রুদ্রর লাশটাও শোয়ানো থাকত রাজর্ষি আর প্রলয়ের পাশে।

পুলিশ অফিসার আবারও জানতে চাইলেন, 'মেয়ে দুটোকে চিনতে পারছেন?'

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সংজ্ঞা হারাবার আগে রুদ্র জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ওরাই। কৃষ্ণকলি আর রাধিকা।'

পাতাল বটুক

শীতের সকালে তাদের ছোট্ট বারান্দায় বসে বেশ আয়েস করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ দেখছিল পর্ণাভ। হঠাৎই একটা পাতায় একটা ছোট খবরে চোখ আটকে গেল তার। মাত্র চোদ্দ পনেরো লাইনের একটা খবর। আর পর্ণাভ সেটা পাঠ করেই বেশ উত্তেজিতভাবে বলল, 'আরে দ্যাখো বড় জ্যাঠার খবর বেরিয়েছে কাগজে।'

রান্না ঘরে ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছিল সেমন্তী। পর্ণর কথা শুনে সে বারান্দাতে এসে বলল, 'বড় জ্যাঠা মানে সেই যে যিনি...।'

সেমন্তীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে পর্ণাভ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই। কাগজে কি লিখেছে শোন —

কথাটা বলেই সংবাদটা পাঠ করতে শুরু করল—

'যাবজ্জবীন কারাদণ্ড প্রাপ্ত বন্দির মুক্তি।'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা—

দীর্ঘ পনেরো বছর পর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেলেন খুনের মামলার আসামি ঈশান চক্রবর্তী। পনেরো বছর আগে বীরভূম জেলার বাসিন্দা ঈশান চক্রবর্তী তার স্ত্রী তারাসুন্দরীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। নিম্ন আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ শুনিয়েছিলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই সাজা খাটছিলেন ঈশান। যদিও উচ্চ আদালতে তিনি তার প্রতি সুবিচারের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী নানা টালবাহানা ও আদালত কর্মীদের মন্থরতার ফলে মামলার শুনানি হতে পনেরো বছর সময় লেগে গেল। অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য ডিভিশন বেঞ্চ ঈশান চক্রবর্তীকে বেকসুর খালাস বলে ঘোষণা করেছেন। সকালে আদালতের রায় বেরবার পর দীর্ঘ পনেরো বছর মিথ্যা মামলাতে সাজা খেটে এদিন বিকালেই সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বীরভূমে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হয়েছেন তিনি।'

লেখাটা পাঠ করে পর্ণাভ বেশ উৎফুল্ল ভাবে বলল, 'আজ যদি বাবা-মা বেঁচে থাকতেন তবে খুব খুশি হতেন এ খবরটা শুনে। যদিও বড় জ্যাঠামশাই ঠাকুর্দার পালিত পুত্র ছিল। সন্তান না হওয়ার কারণে প্রথমে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন তাকে। তারপর ঠাকুমার তিন সন্তান বাবা কাকাদের একে একে জন্ম হয়, তবু তিনি বাবার দাদা তো। শেষের দিকে ঠাকুমা বাবা-কাকাদের খুব বেশি যোগাযোগ না থাকলেও জেঠাইমার খুনের ঘটনাটা ঘটে যাবার পর বাবা কিন্তু প্রায়ই বলতেন, 'হতে পারেন তিনি তন্ত্র সাধনা করেন, তাই বলে নিজের স্ত্রীকে খুন করবেন তা হতেই পারে না। তারাসুন্দরীদেবীর পৈত্রিক সম্পত্তিতে অনেক বড় অংশ ছিল। আর সেই সম্পত্তির লোভে তার জ্ঞাতি ভাইরাই তাকে খুন করায়, তারপর ঈশান চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে জেলে পাঠায়। সত্যি একদিন প্রকাশ পাবেই।'

সেমন্তী জানতে চাইল, 'তোমার জেঠাইমার খুনের ঘটনা যখন ঘটে তখন তোমার বয়স কত?'

পর্ণাভ বলল, 'পনেরো-ষোলো বছর হবে। তবে জ্যাঠাইমার মুখটা আমার ঠিক মনে নেই। বাবার সঙ্গে আমার শেষ ওই বাড়িতে যাওয়া বছর দশেক বয়সে। আমার জন্মের অনেক আগেই ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর ঠাকুমা বীরভূমের পাঠ চুকিয়ে নিজের ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। সেখানে শুধু রয়ে গেছিলেন বড় জ্যাঠা। তারপর তিনি বিয়ে করেন।

আমার কিন্তু বড় জ্যাঠার চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে। টকটকে ফর্সা লম্বা চেহারা। খালি গা, গলাতে রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে একট লাল কাপড় লুঙ্গির মতো করে পরা। পায়ে কাঠের খড়ম। তখন মনে হয় তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি ছিল। আমি তার আগে কোনো দিন খড়ম দেখিনি। তাই তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'বড় জ্যাঠা' আপনার পায়ে ওটা কী?'

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'একে খড়ম বলে। বেল কাঠের পাদুকা।'

তারপর তিনি হেসে জানতে চেয়েছিলেন, 'তুমি আমাকে বড় জ্যাঠা বলছ কেন? শুধু জ্যাঠা বা জ্যাঠামশাই বললেই তো হয়?'

জবাবটা অবশ্য আমার হয়ে বাবাই দিয়েছিলেন, 'আসলে অন্য ভাইয়ের ছেলেরা তো আপনাকে বড় জ্যাঠা বলে। তা শুনেই ও বলেছে।' ব্যস এটুকু স্মৃতিই আমার মনে আছে।'

সেমন্তী এরপর প্রশ্ন করল, 'উনি জেলে যাবার পর তোমরা কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে যাওনি?'

পর্ণাভ জবাব দিল, 'বাবা একবার গেছিলেন। অন্য কাকারা যাননি। আসলে বাবার সঙ্গেই যা একটু সম্পর্ক ছিল বড় জ্যাঠার। ঠাকুমা আর কাকারা তো পরের দিকে বড় জ্যাঠার নামই সহ্য করতে পারতেন না ঠাকুর্দা বীরভূমের বাড়িটা বড়জ্যাঠাকে লিখে দিয়েছিলেন বলে। বাগান সমেত পেল্লায় দোতলা বাড়ি। ঠাকুর্দা জজকোর্টের উকিল ছিলেন। দু-হাতে পয়সা রোজগার করতেন।'

সেমন্তী জানতে চাইল, 'তোমার ঠাকুর্দাই বা স্ত্রী, নিজের সন্তানদের বঞ্চিত করে বাড়িটা বড় জ্যাঠাকে লিখে দিয়েছিলেন কেন?'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটু ভেবে পর্ণাভ বলল, 'আসলে বড় জ্যাঠা তেমন পড়াশোনা করেননি বাবা-কাকাদের মতো। ঠাকুর্দা কোর্টের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আর ঠাকুমা নিজের ছেলেদের নিয়েই। যতদূর জানি ক্লাস এইটের পর আর পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি বড় জ্যাঠার। সম্ভবত শেষ জীবনে ঠাকুর্দা তার দত্তক পুত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কিত ছিলেন। ঠাকুমাও খুব একটা ভালো ব্যবহার করতেন না তার সঙ্গে। কাজেই তার দত্তক পুত্র ভবিষ্যতে কোথায় থাকবে, কী খাবে, এ সব ভেবে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দা বড় জ্যাঠাকেই বাড়িটা লিখে দেন।

তাছাড়া বড় জ্যাঠাকে স্নেহ করার পিছনে ঠাকুর্দার আর একটা কারণ ছিল। ঠাকুর্দাও একটু আধটু জ্যোতিষচর্চা করতেন। আর বড় জ্যাঠার কিশোর বয়স থেকেই তন্ত্রসাধনার প্রতি ঝোঁক ছিল। বীরভূম জেলা হল তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান। অনেক তান্ত্রিকের দেখা মেলে সেখানে। এ ব্যাপারটাতে কিছুটা মিল ছিল তাদের দুজনের মধ্যে। আর ঠাকুর্দা কিন্তু ঠাকুমা বা, বাবা-কাকাদের বঞ্চিত করেননি। ঠাকুর্দা তার গচ্ছিত মোটা অঙ্কের টাকা সম্পূর্ণটাই দিয়েছিলেন ঠাকুমা ও অন্য পুত্রদের।'

সেমন্তী বলল, 'অত বড় বাড়িতে তবে এখন একা কী করবেন বড় জ্যাঠা? নতুন করে আবার বিয়ে করার, সংসার করার বয়সও তো পেরিয়ে গেছে।'

পর্ণাভ কথাটা শুনে হেসে বলল, 'আমার কী মনে হচ্ছে জানো? একবার বড় জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কেমন হয়? আমার পরিচয় পেলে হয়তো বা তিনি খুশিই হবেন। বাবাকে তিনি স্নেহ করতেন। সেই সঙ্গে পূর্বপুরুষদের ভিটেটাও দেখিয়ে আনা যাবে তোমাকে। কিছুটা আউটিং-ও হবে। অফিস আর বাড়ি করা ছাড়া অনেক দিন বাইরে যাওয়া হয়নি। আমার অফিসে ছুটি জমেছে। যাবে নাকি ক'দিনের জন্য? ফেরার পথে তারাপীঠ, শান্তিনিকেতন হয়ে ফেরা যেতে পারে। তাছাড়া...।'—এই বলে থেমে গেল পর্ণাভ।

'তাছাড়া কী?' জানতে চাইল সেমন্তী।

পর্ণাভ বলল, 'এ খবরটা হয়তো তোমার খুড়তুতো দেওরদেরও চোখে পড়বে। এত বড় সম্পত্তিটার ওপর ওদের বেশ লোভ আছে। এর আগে একটা বিয়ে বাড়িতে ওদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে ওরা বাড়িটার ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছিল। বলেছিল বাড়ি-জমিটা কোনোভাবে বিক্রির বন্দোবস্ত করা যায় কিনা? তখন অবশ্য জানা ছিল না যে বড় জ্যাঠা কোনোদিন মুক্তি পাবে। আমি অবশ্য বাড়িটা নিয়ে বেআইনি ঝামেলাতে যেতে রাজি হইনি। বড় জ্যাঠার মুক্তির খবর পেয়ে তারা হয়তো এতদিন পর উপস্থিত হতে পারে বাড়িটা হাতাবার জন্য। আমরাও যাতে বঞ্চিত না হই সে জন্যও একবার ওখানে যাওয়া দরকার।'

সেমন্তী বলল, 'ওসব ব্যাপার তুমি বোঝ। কিন্তু মানবিক কারণেও লোকটাকে একবার দেখে আসা দরকার। বিনা দোষে এতগুলো বছর জেল খাটলেন। একে তার আর কেউ নেই, তার ওপর আবার বয়সও হয়েছে।'

পর্ণাভ হিসাব করে বলল, 'তা সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সতো হবেই।'

সেমন্তী বলল, 'সমস্যা হল, আমাদের দেখেও তিনি যদি ভাবেন—আমরা ওই সম্পত্তির লোভে দেখা করতে গেছি? তিনি যদি আমাদের সেখানে থাকতে না দেন তখন?'

পর্ণাভ বলল, 'তিনি কি ভাববেন তা জানি না। তবে থাকতে তিনি দেবেন বলেই মনে হয়। কারণ, ঠাকুর্দা তাকে বাড়িটা দান করলেও তার দানপত্রে একটা শর্ত ছিল যে ঠাকুর্দার অন্য কোনো পুত্র অথবা তার পৌত্ররা যদি তার পূর্বপুরুষের ভিটেতে এসে থাকতে চায় তবে সাত রাত থাকতে দিতে হবে। পূর্ব পুরুষদের ভিটে দেখা থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এ সব নিয়ে অযথা ভেবে লাভ নেই। গেলে চলো। তবে গাড়িতে করে দুদিন পর রবিবার সকালেই বেরিয়ে পড়ব। কলকাতা থেকে সেখানে পৌঁছতে ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে। সিউড়ি পর্যন্ত রাস্তা আমি চিনি। তারপর সেখান থেকে হরীতকী বাগান কোথায় জেনে নেব। অসুবিধা হবে না।'

সেমন্তী বলল, 'ঠিক আছে চলো তবে। রবিবারেই রওনা হব তোমার বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের উদ্দেশে। তিনি এখন কলঙ্কমুক্ত একজন মানুষ। ঠিক আমাদেরই মতো। তার সঙ্গে দেখা করতে এখন আর অন্য কোনো বাধা নেই।'

২

গাড়ি চালাচ্ছিল পর্ণাভই। তার বাবার আমলের পুরোনো অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা যত্নে রাখার কারণে এখনও বেশ ভালোই চলে। পর্ণাভর পাশের আসনে বসে সেমন্তী। কোনো ড্রাইভারকে সঙ্গে নিলে আবার তার থাকা-খাওয়ার হাঙ্গামা আর বাড়তি অনেকগুলো টাকা খরচ দিতে হতো। সকালে যখন তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তখন কলকাতা শহরে শীতের কুয়াশা কাটেনি।

ওদের কোনো তাড়া নেই। তাই ধীরে সুস্থেই গাড়ি চালাচ্ছিল পর্ণাভ। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল বর্ধমানের শক্তিগড়। সেখানে চা জলখাবার খেয়ে আবার যাত্রা শুরু। ফাঁকা রাস্তা। দুপাশে কোথাও অনাবাদি জমি, কোথাও ধানের ক্ষেত। আবার কোথাও ছোট ছোট বাজার-দোকানপাট। শীতের সবজি সাজিয়ে বসেছে চাষীরা। গ্রামের দিকে বড় একটা আসা হয় না পর্ণাভর। তাই চারপাশ দেখতে দেখতে এগোতে বেশ ভালোই লাগছিল তাদের। বেলা দশটা নাগাদ সিউড়িতে পৌঁছে গেল তারা। বেশ বড় মফস্বল শহর। আধুনিক দোকান, বাজার লোকজন সবই আছে। তবে তারা শহরের ভিতর ঢুকল না। শহরে ঢোকার রাস্তার মুখে একটা ছোট চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি থেকে নামল চা পান করার জন্য আর হরীতকী বাগানের রাস্তাটা চিনে নেবার জন্য। চায়ের দোকানের সামনে কেঠো বেঞ্চে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন কয়েকজন বৃদ্ধ। পর্ণাভ চায়ের দোকানীকে দু-ভাঁড় চা দিতে বলার পর তাদের দেখে এক বৃদ্ধ কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, 'কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?'

পর্ণাভ বলল, 'কলকাতা থেকে আসছি। হরীতকী বাগান যাব। জায়গাটা কোথায় বলতে পারেন?'

প্রশ্ন শুনে এক বৃদ্ধ বললেন, 'এখান থেকে সোজা রাস্তা ধরে পাঁচ মাইল গেলে, বাম হাতে পঞ্চায়েতের সুরকি বিছানো রাস্তা পাবেন। সে রাস্তা ধরে মাইল তিনেক হর্তুকিবাগান। এক সময় ওখানে অনেক হর্তুকি গাছ ছিল। এখন আর নেই। নামটাই শুধু রয়ে গেছে। ওখানে একটা পুকুর আছে 'কালো বাওড়' নাম। আমি এককালে ওখানে মাছ ধরতে যেতাম।'

'কালো বাওড়' নামটা শুনে পর্ণাভর তার বাবার মুখে শোনা একটা কথা মনে পড়ে গেল। লোকজনের সামনে পর্ণাভ আর কথাটা বলল না সেমন্তীকে।

চা-পান হয়ে গেলে আবার গাড়িতে উঠে এগোতে এগোতে পর্ণাভ এবার বলল, 'উনি যে কালো বাওড় নামের পুকুরটার কথা বললেন ও নাম আমি বাবার মুখে শুনেছি। ছেলেবেলাতে বাবার সঙ্গে যখন এসেছিলাম তখন দেখেছি ও। হয়তো এখন খেয়াল করতে পারছি না।'

এরপর একটু হেসে সে বলল, 'বাবার মুখে শুনেছি, ওই পুকুরেই নাকি বড় জ্যাঠাইমার লাশটা ভেসে উঠেছিল।'

কথাটা শুনে সেমন্তী বলল, 'জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল ওনাকে?'

পর্ণাভ বলল, 'না জলে ডুবিয়ে নয়। তার দেহটা জলে ফেলা হয়েছিল তাকে খুন করার পর। মুন্ডুহীন লাশ। ধড়টাই কেবল ভেসে উঠেছিল। কে যেন মুন্ডুটা কেটে ফেলেছিল কোনো ধারালো

অস্ত্রের এক কোপে। পুকুরে জালটাল ফেলেও আর জেঠাইমার মুন্ডুটা উদ্ধার করা যায়নি।'

পর্ণাভ সম্ভবত এরপর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ওই মুন্ডুকাটা লাশের কথা শুনে সেমন্তী আঁতকে উঠে বলল, 'থাক থাক ও সব ব্যাপার নিয়ে এই সকালে আর আলোচনা করার দরকার নেই। ওসব কথা বাদ দাও।'

সেমন্তী তার কথা শুনে ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে পর্ণাভ আবার কথা থামিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল।

নির্দেশিত পথ ধরেই এগোল তারা। প্রথমে পাঁচ মাইল পথ এগোবার পর বড় রাস্তা ছেড়ে সুরকির রাস্তা ধরল গাড়ি। এ জায়গাটা এখনও তেমন উন্নত হয়নি। দু-চারটে ঘরবাড়ি এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে। বড়বড় গাছও আছে বেশ কিছু। সে পথ ধরে মাইল তিনেক এগোবার পর রাস্তার পাশেই একটা বেশ বড় পুকুর চোখে পড়ল। পর্ণাভ বলল, 'এটাই কালো বাওড় হবে। দেখেছ জলের রঙ কেমন কালো! আমরা পৌঁছে গেছি।'

পুকুর পাড়ে বসে একটা লোক ছিপ হাতে মাছ ধরছিল। গাড়ি থামিয়ে গলা বাড়িয়ে পর্ণাভ তাকে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, এখানে চক্রবর্তীদের বাড়িটা কোন দিকে?'

প্রশ্ন শুনে মৃদু বিস্মিতভাবে পর্ণাভর দিকে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'ও! উকিলবাবুর পুরোনো বাড়ি! ওই তো কাছেই।' হাত তুলে একটা দিকে দেখাল লোকটা।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পর্ণাভ দেখল, কিছুটা দূরে গাছগাছালির মাথার ওপর দিয়ে একটা বাড়ির চিলেকোঠা যেন দেখা যাচ্ছে। গাড়ির অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিল পর্ণাভ।

সেমন্তী বলল, 'সিউড়ি শহর থাকতে এই নির্জন জায়গাতে তোমার ঠাকুর্দা বাড়ি বানিয়ে ছিলেন কেন? তার তো পয়সার অভাব ছিল না!'

গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে পর্ণাভ বলল, 'বাবার মুখে শুনেছি এ বাড়ি নাকি ''কূর্মভূমি''। অর্থাৎ কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু জায়গা। চারপাশে ঢাল আছে। অনেক দূর থেকে দেখলে নাকি বোঝা যায়। ঠাকুর্দা জ্যোতিষ শাস্ত্র, বাস্তু শাস্ত্র এসব মানতেন। শাস্ত্রমতে নাকি এই কূর্মভূমি বাসস্থান নির্মাণ, তন্ত্রসাধনার পক্ষেও আদর্শ স্থান। তিনি তাই বাড়িটা এখানে বানিয়েছিলেন। বাড়ির কাছেই নাকি কোথাও একটা ছোট শ্মশানও আছে। ঠাকুর্দা আর বড় জ্যাঠা সেখানে নাকি যাওয়া আসা করতেন।'

কথা বলতে বলতেই গাড়িটা পৌঁছে গেল পর্ণাভর পৈতৃক বসতবাটির সামনে। গাড়ি থেকে নামল পর্ণাভ আর সেমন্তী।

অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা বড় বড় গাছের বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট প্রাচীন বাড়িটা। একতলা, দোতলার টানা বারান্দা বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। সিমেন্টের নক্সা কাটা রেলিং ঘেরা ছাদে যে চিলেকোঠার ঘর রয়েছে সেটাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল পর্ণাভ। ছাদের রেলিং কোথাও কোথাও ভেঙে গেলেও আর বাড়ির দেওয়ালের গা থেকে পলেস্তারা খসে পড়লেও বাড়ির কাঠামোটা

অক্ষুণ্ণই আছে। পুরোনো দিনের বাড়ি চট করে নষ্ট হয় না। অবাক হয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সেমন্তী প্রশ্ন করল, 'বাড়িটার কত বয়স হবে?'

পর্ণাভ জবাব দিল, 'তা অন্তত একশো বছর হবে।'

আগল সরিয়ে বাগানে প্রবেশ করে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। নীচে বা ওপরের বারান্দাতে কেউ কোথাও নেই। কাছ থেকে দেখে তারা দেখল বারান্দা সংলগ্ন ঘরগুলোর অনেককটা দরজা জানলারই পাখিতোলা পাল্লাগুলো ঘুণ ধরে, জলে ভিজে খসে পড়েছে। বটের চারা শিকড় বিস্তার করেছে বারান্দার থামগুলোর গায়ে। কোথাও কোনো লোকজন নেই। একদল পায়রা শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দাতে।

সেমন্তী বলল, 'কাগজে ঠিক লিখেছিল তো? তিনি এখানেই ফিরে এসেছেন? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না! বাড়িটাকে জাস্ট ভূতের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে! ভূতের সিনেমার শুটিং-এর পক্ষে আইডিয়াল জায়গা!'

বাড়িটার এক পাশের ফাঁকা অংশ দিয়ে পিছনের দিকের বাগানের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সেমন্তী কথাটা বলার পরই হঠাৎ সেদিকে চোখ গেল পর্ণাভর। সেখানে একটা গাছের তলায় বাড়িটার দিকে পিছন ফিরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে একটা লাল লুঙ্গির মতো পোশাক, গায়ে একটা লাল র‍্যাপার। মাথার চুল সম্ভবত সাদা। তাকে দেখতে পেয়ে পর্ণাভ বলল, 'ওই দ্যাখো! বড় জ্যাঠাই মনে হচ্ছে! জেলের ডোরাকাটা জামা ছেড়ে বাড়িতে ফিরেই আবার রক্তাম্বর ধারণ করেছেন মনে হচ্ছে!'

বাড়িটাকে একপাশে রেখে পর্ণাভরা এগোল সেদিকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে তারা পৌঁছে গেল গাছটার কাছে। মাঝারি আকৃতির একটা গাছ। তার ডালপালাগুলো মাথার ওপরে ছাতার আকৃতির চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত তাদের পায়ের শব্দ পেয়েই ফিরে দাঁড়াল লোকটা। দীর্ঘকায় মেদহীন গৌরবর্ণ চেহারা। ভ্রূ, দাড়ি, চুলের রঙ সাদা। টিকালো নাক। চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। দাড়ি স্পর্শ করেছে বুক। বয়স মনে হয় সত্তরের ওপর হবে। তবে তার চোখের দৃষ্টি এখনও বেশ তীক্ষ্ণ। পর্ণাভ চিনতে পারলেন তাকে। ইনিই তার জেল খাটা বড় জ্যাঠামশাই ঈশান চক্রবর্তী। তিনি পর্ণাভদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কারা? দেখে তো শহরের লোক মনে হচ্ছে! সাংবাদিক?'

পর্ণাভ তাকে প্রথমে প্রশ্ন করল, 'আপনি বড় জ্যাঠামশাই তো?'

'বড় জ্যাঠামশাই!' শব্দটা বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে বৃদ্ধ যেন তার স্মৃতি হাতড়ে মনে করার চেষ্টা করলেন এ নামে তাকে কেউ কোনো দিন ডাকত কিনা?

তিনি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছেন না দেখে পর্ণাভ এরপর বলল, 'আমি পর্ণাভ। আপনার ভাই ইন্দ্রর ছেলে আমি। পর্ণাভ চক্রবর্তী। আর এ আমার স্ত্রী সেমন্তী।'

কথাটা শুনে ঈশান চক্রবর্তী বেশ কিছুক্ষণ বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। তারপর বললেন, 'ইন্দ্রর ছেলে তুমি! সত্যি বলছ?'

পর্ণাভ হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি। সঙ্গে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড আছে। দেখাতে পারি।'

ঈশান বললেন, 'থাক, থাক ওসব আর দেখাবার দরকার নেই, বিশ্বাস করলাম। কত বছর পর নিজের কাউকে দেখলাম। বড় ভালো লাগছে।'

সেমন্তী ঈশান চক্রবর্তীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পর্ণাভর আবার ঠিক প্রণাম-টনাম আসে না। সে তারপর বলল, 'কাগজে আপনার খবরটা দেখে মনে হল একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে আসি। তাছাড়া সেমন্তীকেও এই সুযোগে পূর্বপুরুষের ভিটেটা দেখানো হয়ে যাবে—তাই চলে এলাম।'

ঈশান চক্রবর্তী বললেন, 'ইন্দ্র মারা গেছে!'

পর্ণাভ বলল, 'হ্যাঁ, বছর ছয়েক হল। আর দু-বছর আগে মা। কাকারাও আর নেই। তবে তাদের ছেলেরা আছে।'

ঈশান আপশোসের সুরে বলল, 'আসলে গত পনেরো বছর জেলের চার দেওয়াল আমাকে বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছিল। কিছুই জানতে পারিনি। সবই আমার অদৃষ্ট। যতই তারা দূরে থাকুক তারা আমার ভাই ছিল। আমি এখন আত্মীয় পরিজনহীন এক জেলখাটা আসামি।'

সেমন্তী বলল, 'এমন ভাবে বলবেন না বড় জ্যাঠামশাই। আমরা কি আপনার নিজের লোক নই?'

ঈশান হেসে বললেন, 'না, না, তোমরাও আমার নিজের লোকই। আমি এভাবে কথাটা বলিনি।'

পর্ণাভ এবার আসল কথাটা পাড়ল। সে বাগানের চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'কী নিরিবিলি সুন্দর জায়গা! ভাবছি আপনার সঙ্গে দু-তিনটে দিন এ বাড়িতে কাটিয়ে যাই। আর কোনোদিন এখানে আসা হবে কিনা জানা নেই।'

সেমন্তী বলল, 'হ্যাঁ, আমারও বেশ লাগছে জায়গাটা। চারদিকে কত সবুজ! কলকাতার মতো ধুলো-ধোঁয়া নেই।' তাদের কথা শুনে ঈশান বললেন, 'কিন্তু তোমরা কি এ বাড়িতে থাকতে পারবে? ইলেকট্রিক নেই, রান্নাঘরের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি এসে দুটো ঘর মাত্র সাফশুতরো করেছি। একটা লড়ঝড়ে তক্তপোষ ছাড়া কিছুই তোমাদের দিতে পারব না। বাড়ির সামনের দিকে বাগানের একপাশে একটা কুয়ো আছে। স্নান খাওয়ার জল বলতে কিন্তু সেটাই। পর্ণাভ বলল, 'তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের গাড়িতে রান্নার জন্য গ্যাস, ওভেন, ইত্যাদি সব কিছুই আছে। তৈরি হয়েই বেরিয়েছি আমরা। সিউড়ি বাজার তো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। যা, যা প্রয়োজন হবে তা কাল সকালে কিনে আনব।'

ঈশান বললেন, 'তবে থাকো। বাড়িটা তো এক অর্থে তোমাদেরও। চলো ঘরটা দেখিয়ে দিই।'

বাগান ছেড়ে বাড়ির সামনের দিকে এল সবাই। বারান্দা দিয়ে উঠে সিঁড়ি ভেঙে দোতলাতে পৌঁছে গেল তারা। দোতলার বারান্দাও কাঠকুঠো, পায়রার বিষ্ঠাতে ভর্তি। দরজা ঠেলে বারান্দা সংলগ্ন একটা ঘরে তাদেরকে নিয়ে প্রবেশ করে ঈশান বললেন, 'এই তোমাদের ঘর। দ্যাখো থাকতে পারো কিনা?'

মোটামুটি পরিষ্কার একটা ঘর। যদিও দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছে, মেঝেও ফেটে গেছে জায়গাতে জায়গাতে। আসবাব বলতে ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের তক্তেপোষ বা চৌকি রাখা।

ঘরের কোণে রাখা আছে একটা নতুন ঝাঁটা। বেশ বড় একটা জানলা আছে ঘরে। তা দিয়ে পিছনের বাগানটা দেখা যাচ্ছে।'

সেমন্তী ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'কোনো অসুবিধা হবে না। আর একটা কথা, বড় জ্যাঠামশাই আমরা যে দু-তিন দিন আছি, একটা দিন কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।'

ঈশান হেসে বললেন, 'আমাকে নিয়ে ভেব না। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আমি এ বাড়িতে ফিরে এলাম কেন জানো? আসলে আমার একটা সাধনা অসম্পূর্ণ রেখে গেছিলাম। এবার তা সম্পূর্ণ করার সময় হয়েছে। তন্ত্র সাধকদের কিছু নিয়ম মানতে হয়। আমি একবেলা ভোজন করি, তাও নির্দিষ্ট কিছু জিনিস। তোমরা তোমাদের মতো থাকো, খাও—কোনো অসুবিধা নেই। এ কথা বলে তাদেরকে ঘরটা বুঝিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন ঈশান।

তারা দুজন এরপর কাজে লেগে পড়ল। পর্ণাভ ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে রাস্তা থেকে গাড়িটাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল প্রথমে। তারপর গাড়ি থেকে মালপত্র নিয়ে ওপরের ঘরে তুলতে লাগল। সেমন্তী লেগে গেল ঘরের সামনের বারান্দা পরিষ্কার আর রান্নার কাজে। রান্না মেটার পর নীচে নেমে কুয়োর ঠান্ডা জলে স্নান সেরে নিল সেমন্তী। পর্ণাভ তাকে বারণ করেছিল, কিন্তু সে শোনেনি। পুরোনো বাড়ি, বাগান, কুয়ো, এ সবই নতুন তার কাছে। বেশ লাগছে এ জায়গাটা। স্নান খাওয়া সেরে তক্তপোষে শুয়ে পড়ল তারা।

৩

সেমন্তীর ডাকে পর্ণাভর যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকাল হয়ে গেছে। চা করছে সেমন্তী। একটা চায়ের কাপ পর্ণাভর হাতে ধরিয়ে দিয়ে, নিজের কাপটা হাতে নিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নীচে বাগানের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বড় জ্যাঠামশাই বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন।'

পর্ণাভ উঠে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে পেল। শীতকাল, বেলা পড়ে এসেছে। বিকাল পাঁচটা বাজে। দিনের শেষ আলোতে ছাতার মতো সেই পাতাঅলা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছেন ঈশান চক্রবর্তী। সেমন্তী বলল, 'ওঁকে দেখে আমার বেশ ভালো মানুষই মনে হল। কেমন নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে মানুষটাকে। স্ত্রীকে তো হারালেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা মামলাতে এতগুলো বছর জেল খাটলেন।'

চায়ে চুমুক দিয়ে পর্ণাভ বলল, 'চলো, একবার নীচ থেকে ঘুরে আসি। বাগান দেখাও হবে আবার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘর ছেড়ে নীচে নেমে বাগানের সেই গাছটার কাছে হাজির হয়ে গেল তারা। ঈশান তন্ময় ভাবে তাকিয়েছিলেন গাছটার দিকে। পর্ণাভদের দেখার পর ঈশান বললেন, 'কী? কেমন লাগছে?'

সেমন্তী বলল, 'খুব ভালো। আচ্ছা, ওটা কী গাছ জ্যাঠামশাই?'

গাছটার দিকে তাকিয়ে এবার যেন আবছা হাসি ফুটে উঠল ঈশান চক্রবর্তীর শুভ্র দাড়ি গোঁফের ফাঁকে। তিনি বললেন, 'হরীতকী গাছ। তবে এক বিশেষ হরীতকী গাছ। নিশীথ হরীতকী। তন্ত্র সাধনার কাজে লাগে। দুষ্প্রাপ্য গাছ। বছরে একবার একটা মাত্র ফল ধরে। বলতে গেলে এই গাছটার জন্যই আমি এত বছর পরে এখানে ছুটে এলাম। আমাকে যেদিন পুলিশ ধরল তার আগের দিন ছিল অমাবস্যার রাত। যে রাতে শুদ্ধ হয়ে গাছটা পুঁতেছিলাম। জেলে বসে খালি ভাবতাম গাছটা যদি বেঁচে না থাকে তবে আমার সব কষ্ট বৃথা হয়ে যাবে। আমার সাধনা এ জীবনে আর সম্পন্ন হবে না। কিন্তু কালভৈরব করুণাময়। তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন গাছটাকে।'

সেমন্তী জানতে চাইল, 'ফল ধরেছে গাছটাতে?'

ঈশান বললেন, 'যতক্ষণ না কোনো গাছে ফল বা বীজ ধরছে ততক্ষণ সে গাছ তন্ত্র সাধনার কাজে লাগে না। সাধারণ যে পূজা-অর্চনা, তাতে যে আম্রপল্লব ব্যবহার করা হয়, তা সে গাছে যদি ফল না ধরে থাকে তা শাস্ত্র মতে ব্যবহার নিষিদ্ধ। আর এ গাছের ফলটাই তো আসল। ভালো করে সেদিকে তাকাবার পর ফলটা চোখে পড়ল সেমন্তী আর পর্ণাভর। সাধারণ হরীতকী তারা দেখেছে। কিন্তু এই ফলটা তার তুলনাতে আকারে বেশ বড়। খাঁজ কাটা কালো রঙের ফল। হয়তো বা ফলটার কৃষ্ণ বর্ণের কারণেই ওর নাম, 'নিশীথ হরীতকী।'

ঈশান এরপর চারপাশে বাগানের অন্য গাছগুলো দেখিয়ে বলল, 'এ বাগানে অন্য যে সব বড় গাছ দেখছ তা সবই আমার নিজের হাতে পোঁতা।'

এ কথা বলে তিনি আঙুল তুলে আশেপাশের গাছগুলো চিনিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ওটা হল অশ্বত্থ গাছ, তার পাশে যজ্ঞডুমুর, পরেরটা বহরা, তার বাম দিকে শ্বেতখাদির গাছ, আর ডান দিকের গাছটা অর্জুন। প্রাচীরের কাছে গাছটা হল, ঘোড়া নিম। আর দক্ষিণের গাছটা হল রক্তচন্দন। আমরা যে গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সেটা তো বললামই যে নিশীথ হরীতকী। সব মিলিয়ে আটটা বড় গাছ। তার মধ্যে এই হরীতকী গাছটাই আমার সাধনার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ গাছ আমি সংগ্রহ করে এনেছিলাম পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথ কেদারনাথ থেকে।'

সেমন্তী বলল, 'তন্ত্রসাধনাতে নানা অদ্ভুত জিনিস লাগে তাই না?'

ঈশান বললেন, 'তন্ত্র সাধনার জন্য মুখ্য অঙ্গ হল আটটি। গুরু, দীক্ষা, সাধনাস্থল, সময়, আসন, মালা, উপাদান এবং নিষেধ। অর্থাৎ সাধকদের যা করতে নেই। প্রতিটা ব্যাপারেই সাধনার সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক এক ধরনের শক্তি সাধনার জন্য এই মুখ্য অঙ্গগুলোর পরিবর্তন ঘটে।'

সেমন্তীর জ্যোতিষ, তন্ত্র এসব ব্যাপারে মৃদু আগ্রহও আছে। সন্তান হচ্ছে না বলে আঙুলে অনেকগুলো পাথরও ধারণ করেছে সে ডাক্তার দেখানোর পাশাপাশি। পর্ণাভ অবশ্য এসব ব্যাপার ঠিক বিশ্বাস করে না। যদিও সে সেমন্তীকে নিষেধও করে না এসব ব্যাপারে। যার যার ভাবনা তার কাছে।

বড় জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনে সেমন্তী বলল, 'মুখ্য অঙ্গ পরিবর্তন মানে? কেমন পরিবর্তন হয়?'

ঈশান হেসে বললেন, 'সব তো তুমি বুঝবে না মা। তবু তোমাকে সরল ভাবে কিছুটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

এ কথা বলে একটু যেন ভেবে নিয়ে ঈশান বললেন, 'ধরো একটা অতি পরিচিত তন্ত্রসাধনা হল—বশীকরণ তন্ত্রসাধনা। অনেকেই এই সাধনাতে সিদ্ধ হবার চেষ্টা করে। যদিও এটি অত্যন্ত নিম্ন বর্গের তন্ত্র সাধনা। যে কারণে অনেকেই সিদ্ধিলাভ করে এ সাধনাতে। তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে এ ক্ষমতা রপ্ত করতে সাধনাস্থল তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটা কাঠের পাটাতন বিছিয়েই সাধনাস্থল রচনা করা যায়। সময় হল শনিবার রাত্রিকালে যে কোনো সময়, দিক হল পশ্চিম দিক, অর্থাৎ যে দিকে মুখ করে মন্ত্র জপ করবে, আসন হল রক্তবর্ণের, মালা হল ''হাকিক'' মালা বা বিশেষ ধরনের মালা বা সাতাশ দানার মুগার মালা আর উপাদান হল তৈল প্রদীপ আর রুপোর কলস। উপাচারগুলোকে শুদ্ধ করে সাজিয়ে নিয়ে বসে তোমাকে এগারো দিন ধরে দশ সহস্রবার এ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবেঃ*"ওঁ নমো আদেশ গুরু কো রাজা প্রজা মোহং ব্রাক্ষণ বনিয়া মোহং, আকাশ পাতাল মোহং, দশ দিশায়ে মোহং, জো রামচন্দ্র পরমানিয়া অমুক কো অমুক গুরু কী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।"*

আবার ''মারণ উচাটন'' তন্ত্র বিদ্যাতে সিদ্ধি লাভের মন্ত্র হল, ''ওঁ নমো পেঁচকরাজে নমো লক্ষ্মীবাহনে মম অভিলাষা পূর্ণ কুরু ''অমুকস্য'' উচ্চাটনং কুরু কুরু কুরু ঐং হ্রুং ক্লীং গ্লৌ ফট স্বাহা।''—এর দিন হল মঙ্গলবার, সময় অর্ধরাত্রি, আসন হল ছাগ চর্মর, মালা হল আমলকীর। আর প্রধান উপকরণ হল শনিবার, ভবানী নক্ষত্রযুক্ত ধরে আনা কালো প্যাঁচার ডান দিকের ডানার শেষের তিনটে পালক। সাধনাস্থলে বসে প্রথমে উড়িয়ে দিতে হয় পেঁচাটাকে। এবার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে পারলাম যে আলাদা আলাদা তন্ত্রসাধনার জন্য মুখ্য অঙ্গের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?'

বড় জ্যাঠামশাইয়ের এসব অদ্ভুত কথা, মন্ত্রোচ্চারণ শুনে বেশ মজা লাগল পর্ণাভর। যদিও সে মুখের ভাবে তা প্রকাশ করল না। তবে সেমন্তীর মুখ দেখে পর্ণাভর মনে হল এসব কথা শুনে তার বেশ শ্রদ্ধা জেগেছে বড় জ্যাঠামশাইয়ের প্রতি। সেমন্তীর যেন প্রশ্নের শেষ নেই। এরপর সে প্রশ্ন করল, 'অনেক তান্ত্রিক শুনেছি মুখ দেখে মনের কথা বলতে পারেন? কথাটা ঠিক?'

প্রশ্ন শুনে ঈশান একটু তাচ্ছিল্যভাবে প্রথমে বললেন, 'হ্যাঁ, ওসব ওই, বশীকরণ, উচাটন বিদ্যার মতো নিম্ন বর্গের তন্ত্রসাধনার ফলে প্রাপ্ত ক্ষমতা। কাক চরিত বিদ্যা লাভের অঙ্গ। ওসব বিদ্যা তো আমি বহু বছর আগেই করায়ত্ত করেছিলাম।'

এরপর তিনি একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু আমি যে তন্ত্রসাধনা করছি, যার সাধনা করছি তার জন্য বহু বছর সময় লাগে। অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এই সাধনা করতে গিয়ে। ধরো আমার সাধনার আবশ্যিক উপাদান এই হরীতকী গাছটা। সাধারণ হরীতকী গাছ অন্য জায়গাতে পাওয়া গেলেও এই নিশীথ হরীতকী গাছ সংগ্রহ করে আনতে হয় পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চল থেকে। তারপর অন্তত পনেরো, কুড়ি বছর অপেক্ষা করতে হয় এ গাছে ফল ধরার জন্য। সব থেকে বড় কথা হল এই হরীতকী

গাছকে এক বিশেষ ভাণ্ড বা আধারে ভরে মাটিতে রোপন করতে হয় যা আমার সাধনার কঠিনতম পর্ব। সব মানুষ সেটা করতে পারে না। তবে একবার গাছটা রোপণ করে ফল ধরাতে পারলে বলা যেতে পারে, সাধনার অর্ধেক কাজ সাঙ্গ হয়ে গেছে।'

পর্ণাভ কোন একটা গল্পের বইতে যেন পড়েছিল—তান্ত্রিকরা দশমহাবিদ্যার কাউকে অথবা ডাকিনী, যোগিনী এমন কাউকে আহ্বান করে তাকে মন্ত্র দিয়ে বেঁধে অথবা খুশি করে ক্ষমতা লাভ করে। তাই সে নিজেও এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু হলেও খবর রাখে, তা বোঝাবার জন্য বলল, 'আপনি কি দশমহাবিদ্যার মধ্যে কাউকে তুষ্ট করার জন্য বা তার দর্শন লাভের জন্য সাধনা করছেন?'

ঈশান কীভাবে যেন তার মনের ভাব ধরতে পেরে বললেন, 'এসব কথা তুমি গল্পের বইতে পড়েছ বুঝি? আসলে অধিকাংশ তান্ত্রিকরাই এই দশমহাবিদ্যার আবাহন করেন অথবা বিভিন্ন উপদেবীর আবাহন করেন বলে তাদের নিয়েই গল্প-উপন্যাস লেখা হয়। আর ওসব পড়ে মানুষ ভাবে তন্ত্র সাধনা মানেই ওসব নারী মহাবিদ্যা বা উপদেবীর সাধনা। ওসব সাধনা করতে একটু সাহসের দরকার হয় ঠিকই কারণ তারা নানা রূপ ধারণ করে কখনও ভেলকি দেখায়, আবার কখনও ভয় দেখায়। কিন্তু আমি যার সাধনা করছি তার সাধনার জন্য প্রচুর সময় ও সাহসের প্রয়োজন হয়।'

পর্ণাভ বলল, 'তবে কোন দেবীর সাধনা করছেন আপনি?'

একটু চুপ করে থেকে ঈশান বললেন, 'সে হল ''পাতাল বটুক''। বটুক ভৈরব নয়।'

'পাতাল বটুক! সে আবার কে?' বিস্মিত ভাবে জানতে চাইল পর্ণাভ।

সূর্য ডুবে গেছে। আবছা একটা কুয়াশার স্তর আর অন্ধকার ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে গাছগুলোর মাথায়। সেদিকে তাকিয়ে ঈশান বললেন, 'স্বর্গ, মর্ত আর পাতাল নিয়ে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড। দেবতা বা তুমি যে দেবী বা দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী উপ-দেবদেবীর কথা শুনে থাকবে তারা সবাই থাকেন আকাশে। আর মানুষ থাকে আমরা চলতি কথায় পৃথিবী বলতে যে স্থান বুঝি সেখানে। তবে দেবতা, উপদেবতা, যক্ষ মানব ছাড়াও আর এক ধরনের জীবের অস্তিত্ব আছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। দেবতা বা উপদেবতাদের থেকেও বেশি ক্ষমতাধর সেই জীবেরা। যদিও তাদের জীব বলা হয়তো ঠিক নয়। আমাদের পরিচিত কোনো জীবের সঙ্গে তাদের মিল নেই। বলা যেতে পারে, তারা একটা 'ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব।' পাতালে বাস করে তারা।

স্বর্গ, মর্তের কিছু খবর মানুষ জানলেও পাতালের খবর বলতে গেলে অজানা সবার কাছে। ওই 'ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব'দের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন মহাদেব। শিব পুরাণের এক স্থানে এদের উল্লেখ আছে। পাণ্ডবরা যখন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন সে সময় মহাদেব তাদের দর্শন দেবেন না বলে পাতালে প্রবেশ করেন। তখন পাতালে এই ভয়ঙ্কর অস্তিত্বরা মহাদেবের অনুচর হয়, যেমন কৈলাসে ভূতপ্রেতরা তার সঙ্গী। তখন এই সব পাতালবাসী ভয়ঙ্কর অস্তিত্বদের কোনো নাম ছিল না। কিন্তু কোনো নামে তো তাদের ডাকতে হবে। স্কন্ধ পুরাণে আছে মহাদেবের তৃতীয় নয়ন থেকে বটুক ভৈরবের জন্ম হয়েছিল, যে ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করেছিল। তাই মহাদেবের আর এক নাম বটুকেশ্বর। মহাদেব যখন পাতালবাসী বা পাতাল ভৈরব হলেন তখন তিনি তার বহু নামের মধ্যে এই বটুকেশ্বর

নামের প্রথম অংশটা তার পাতালবাসী ভয়ঙ্কর অস্তিত্বদের দান করেন। বটুক ভৈরবের ব্রহ্মহত্যার ভয়ঙ্কর অন্ধকার পাপের মতোই সেই অন্ধকারের বাসিন্দাদের অস্তিত্বের কারণে তাদের এমন নামকরণ করেন মহাদেব। তারা দেবতা, যক্ষ, মানব এমনকী নারী বা পুরুষও নয়। তারা শুধুই ভয়ঙ্কর এক অস্তিত্ব; পাতাল বটুক।' একটানা কথাগুলো বলে থামলেন ঈশান। আকাশ থেকে কুয়াশা মাখা অন্ধকারের চাদরটা এবার দ্রুত নেমে আসতে শুরু করেছে। সেদিকে তাকিয়ে বড় জ্যাঠামশাই বললেন, 'চলো ফেরা যাক। ওই দেখ বাড়ির পিছন দিকে ওই লোহার প্যাঁচালো সিঁড়িটা দিয়েও বাগান থেকে দোতলায় ওঠা যায়।'

সেদিকেই এরপর পায়ে পায়ে এগোল তিনজন। পর্ণাভ বুঝতে পারল এসব তন্ত্র সাধনার ব্যাপার সত্যি হোক বা মিথ্যা হোক বড় জ্যাঠামশাই এ সব ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। একটু কৌতূহলবশত সে জানতে চাইল, বড় জ্যাঠামশাই, ওই পাতাল বটুকের সাধনাতে সিদ্ধি লাভ করলে কি শক্তি লাভ হয়?'

ঈশান বললেন, 'ত্রিকাল দর্শন হয়। বিশেষত অতীত দর্শন বা পাতাল দর্শন। এই যেমন আমার নিজেরই জানা নেই যে আমি কার ঔরসজাত সন্তান ছিলাম? কার গর্ভে জন্মেছিলাম? কোন অপরাধে তারা তাদের সন্তানকে কালো বাওড়ের পাড়ে ফেলে গেছিল? এমনকী আমি আমার পূর্বজন্মগুলোর কথাও জানতে পারব।'

কথা বলতে বলতে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল তারা। ঈশান বললেন, 'এবার তোমরা ওপরে যাও। আমি একটু বাইরে বেরোব।'—এই বলে তিনি অন্য দিকে পা বাড়াতে গেলেন।

সেমন্তী এতক্ষণ চুপ করেছিল, কিন্তু এবার হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আপনি তো বললেন যে বশীকরণ, উচাটন, মনের কথা বলার মতো কাকশাস্ত্র বিদ্যা, এসব আমি বহুদিন আগেই রপ্ত করেছেন। আচ্ছা আপনি বলতে পারবেন, আপনি এখন কী ভাবছি?'

এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ঈশান। সেমন্তীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ মা?'

সেমন্তী প্রশ্নটা শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না, না, এমনি প্রশ্ন করলাম।'

ঈশান মৃদু হেসে বললেন, 'যে কারণেই তুমি প্রশ্নটা করে থাকো, আমি উত্তরটা দিচ্ছি।' কয়েক মুহূর্ত এরপর তিনি স্থির দৃষ্টিতে সেমন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাত বছর বিয়ে হয়েছে তোমার, কিন্তু সন্তান হচ্ছে না। তুমি ভাবছ তন্ত্র সাধনা করে তান্ত্রিকরা কি এমন কোনো দক্ষতা লাভ করতে পারে যার ফলে সে অন্য কাউকে সন্তান লাভ করাতে পারে? ঠিক বললাম কিনা? এও বলি সে ক্ষমতা আমার আছে।' কথাগুলো বলে আর না দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন ঈশান চক্রবর্তী।

কথাটা শুনে বেশ চমকে উঠল পর্ণাভ আর সেমন্তী দুজনেই। ঈশান হয়তো অনুমান করতেই পারল যে তাদের বাচ্চা নেই বলে সেমন্তী এই কথাটাই ভাবছে। বিশেষত বাচ্চা হবার জন্য যে আংটিগুলো সেমন্তী আঙুলে পরেছে সেগুলো তিনি চিনতেই পারেন। কিন্তু তাদের যে—সাত বছরের বিবাহিত জীবন—তা তিনি জানলেন কীভাবে?' তারা দুজন এরপর সেই লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল।

৪

ঘরে উঠে এসে একটা বড় মোমবাতি জ্বালালো পর্ণাভ। সেমন্তীর চোখমুখ থেকে বিস্ময়ের ভাবটা যেন যাচ্ছে না। সে বলল, 'তুমি তো এসব ব্যাপার একদম বিশ্বাস করো না। লোকটার কিন্তু ক্ষমতা আছে। নইলে কীভাবে তিনি জনলেন আমাদের সাত বছর বিয়ে হয়েছে?'

পর্ণাভ বলল, 'এ কথা ঠিকই যে পুরাণ-তন্ত্র এসব ব্যাপার নিয়ে ওনার বেশ পড়াশোনা আছে। ওনার কথাটা যে আমাকেও চমকে দেয়নি তা নয়। কিন্তু এমনও হতে পারে আমাদের পরিচিত কেউ হয়তো বা আমার খুড়তুতো ভাইদের কেউ জেলে কোনো বিশেষ কারণবশত ওর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল আর তাদের থেকেই খবরটা পেয়েছেন উনি।' শেষ কথাটা ঠিক পছন্দ হল না সেমন্তীর। সে বলল, 'তোমার অবিশ্বাস কিছুতেই যায় না। আমি ভাবছি...।' এই বলে থেমে গেল সে।

পর্ণাভ বলল, 'কী ভাবছ?'

একটু চুপ করে থেকে সেমন্তী বলল, 'আমি ভাবছি আমার ব্যাপারে ওনাকে বলে একবার দেখব কিনা? যদি সত্যি কোনো কিছু পারেন তিনি। এ ক'বছরে ডাক্তার-বদ্যি তাবিজ আংটি কোনো কিছু তো কম করলাম না। কোনো কিছুই কাজে এল না। উনি তো নিজের মুখেই বললেন যে এ ক্ষমতা তার আছে। বলব একবার, তুমি কী বলো?'

পর্ণাভর নিজের এ সব ব্যাপারে বিশ্বাস নেই। কিন্তু সে যদি আপত্তি জানায় তবে আর কোনো দিন সন্তান না হলে সেমন্তীর মনে হয়তো এ ভাবনা আসতে পারে পর্ণাভর নিষেধের কারণেই সে একবার সন্তান লাভের সুযোগ হারিয়েছিল। সেমন্তীর কথার কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে পর্ণাভ বলল, 'তুমি যা ভালো বোঝ করো। তবে তোমাকেই কিন্তু কথা বলতে হবে তার সঙ্গে। আমার বলতে লজ্জা করবে।'

পর্ণাভর কথা শুনে সেমন্তী হেসে বলল, 'ঠিক আছে আমিই বলব। তুমি শুধু সঙ্গে থেকো। তাহলেই হবে।'

পর্ণাভ আর সেমন্তী লুডো খেলতে বসল। ঘণ্টা খানেক খেলল তারা। তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে সামনের বারান্দাতে এসে দাঁড়াল তারা। বাইরে চাঁদের আলো চিকচিক করছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ পর্ণাভরা দেখল আগল ঠেলে বাগানে প্রবেশ করলেন বড় জ্যাঠামশাই। তার এক হাতে একটা সরু কঞ্চির মতো একটা লাঠি আর অন্য হাতে কী যেন একটা ঝুলছে। তিনি বাড়ির নীচে বারান্দার কাছে আসতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল পর্ণাভরা। বড় জ্যাঠামশাই মাছ ধরতে গেছিলেন। তার এক হাতে ছিপ আর অন্য হাত থেকে একটা বেশ বড় কালো রঙের মাছ ঝুলছে। তাই দেখে সেমন্তী ওপর থেকে জানতে চাইল, 'জ্যাঠামশাই, কী মাছ ধরলেন?'

ঈশান হঠাৎ তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠে ওপরে তাকিয়ে বললেন, 'শোল মাছ। কালো বাওড় থেকে ধরে আনলাম।'—এ কথা বলেই তিনি বারান্দাতে উঠে নীচের কোনো একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। তাকে আর দেখতে পেল না তারা।

গ্যাস স্টোভ জ্বালিয়ে রাতের খাবার গরম করতে বসল সেমন্তী। কিছুক্ষণ পর তার নাকে যেন নীচ থেকে একটা পোড়া গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। পর্নাভও উৎকট গন্ধটা টের পেয়ে বলল, 'কীসের গন্ধ বলো তো?'

সেমন্তী বলল, 'কাঁচা মাছ পোড়ালে এমন গন্ধ হয়। বড় জ্যাঠামশাই কি শোল মাছ পুড়িয়ে খাচ্ছেন নাকি?'

পর্ণাভ বলল, 'কে জানে হতে পারে হয়তো। সাধু সন্ন্যাসী, তন্ত্র সাধকদের ব্যাপারই আলাদা।'

খাওয়া হয়ে গেল পর্ণাভদের। খাবার পর শোবার আগে জানলার সামনে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। রাতে খাবার পর একটা সিগারেট ধরানো তার অভ্যাস বা বদ অভ্যেসও বলা যায়। সেমন্তীও এসে দাঁড়াল তার পাশে। ঠিক তখনই তারা আবার দেখতে পেল বড় জ্যাঠামশাইকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি বাগানের দিকে এগোলেন। তার কোলে দু-হাত দিয়ে ধরা একটা কলাপাতা। সেই নিশীথ হরীতকী গাছটার কাছে গেলেন তিনি। কলাপাতা থেকে তিনি কী যেন গাছটার নীচে ফেলে ফিরে এসে আবার নীচের বারান্দাতে ঢুকে গেলেন। পর্ণাভদের তিনি খেয়াল করলেন না। সেমন্তী একটা হাই তুলে বলল, 'চলো শুয়ে পড়ি। কাল সকালেই কথাটা ওঁর কাছে পাড়ব।' একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে তক্তপোষে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ল দুজন।

পরদিন বেলা আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙল তাদের। জানলা খুলতেই তারা দেখতে পেল সকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাগানে। দোতলার একটা ভাঙা বাথরুমকেই ওয়াশরুম হিসাবে ব্যবহার করছে তারা। সেখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে তারা নীচে নামল। বাগানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সেমন্তী বলল, 'কাল রাতে আমি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। তবে সেটা সত্যি, নাকি স্বপ্ন কে জানে? মনে হল আমি যেন রাতে বিছানো ছেড়ে উঠে গিয়ে জানলাটা খুললাম। তারপর বাইরে তাকিয়েই দেখলাম ওই নিশীথ হরীতকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। ঘোমটা টানা। পরনে ডুরে শাড়ি। হাতে শাঁখা। সে যেন হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছিল। ব্যাস তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।'

পর্নাভ বলল, 'এত রাতে আবার এখানে মহিলা আসবে কীভাবে? হয়তো পুরোটাই তোমার স্বপ্ন অথবা জানলা খুলে ঘুম চোখে ভুল দেখেছ। কাল বড় জ্যাঠামশাইয়ের মুখে নানা অদ্ভুত গল্প শুনেছ, সেটাই হয়তো কোনোভাবে মনের মধ্যে কাজ করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সেই নিশীথ হরীতকী গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল তারা। চারপাশে তাকিয়ে পর্ণাভ বলল, 'জায়গাটা বেশ সুন্দর তাই না। জ্যাঠামশাই কিন্তু বাড়িটাকে ছোটখাটো পিকনিক পার্টিকে ভাড়াও দিতে পারেন। তাতে তার দুটো পয়সাও হবে। শুধু কয়েকটা ঘর মেরামত করে নিতে হবে আর খবরের কাগজ বিজ্ঞাপন দিতে হবে। বড় জ্যাঠামশাইয়ের মাথায় এটা দেব।'

সেমন্তী বলল, 'আগে আমার কথাটা বলে দেখি উনি কী বলেন? তারপর ওসব নিয়ে আলোচনা কোরো।'

এ কথা বলার পর সে বলল, 'হ্যাঁ, জায়গাটা সুন্দর ঠিকই, তবে একটা জিনিস খেয়াল করেছ? এখনে কোনো পাখি নেই! একটাও পাখির ডাক শুনিনি!'

পর্ণাভ তার কথার জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সে পায়ে পিঁপড়ের কামড় অনুভব করল। ঝুঁকে পড়ে পা ঝাড়তে যেতেই একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। কিছুটা তফাতে পড়ে আছে মাছের একটা মাথা। একটা পোড়া শোলমাছের মাথা। ছোট ছোট লাল পিঁপড়ে সার বেঁধে এগোচ্ছে সেদিকে। তারাই কামড় বসিয়েছে তার পায়ে। জিনিসটা সে সেমন্তীকে দেখাতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় বড় জ্যাঠামশাইয়ের গলা শোনা গেল, 'ওখানে কী করছ? এদিকে এসো।'

বাড়ির পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন বড় জ্যাঠামশাই।

তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পা ঝেড়ে নিয়ে পর্ণাভ আর সেমন্তী এগোল সে দিকে। দুজনে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন, 'ওখানে কী করছিলে?'

পর্ণাভ বলল, 'তেমন কিছু না। এমনি হাঁটতে হাঁটতে গাছটার তলায় দাঁড়িয়েছিলাম।'

ঈশান মৃদু হেসে বললেন, 'আসলে ওই গাছটা তন্ত্রমতে রোপণ করা তো। তাই কিছু নিয়ম মানতে হয়। থুতু, প্রস্রাব, মাথার চুল অথবা অন্য কোনো দেহরস ওখানে ত্যাগ করা যায় না। স্নান না করে গাছের গুঁড়ি স্পর্শ করা যায় না।'

পর্ণাভ হেসে বলল, 'না, আমরা ওসব কিছু করিনি ওখানে।'

ঈশান এরপর জানতে চাইলেন, 'রাতে ভালো ঘুমিয়েছিলে তো? কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

সেমন্তী বলল, 'না, বড় জ্যাঠামশাই, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তবে আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।'

'কী নিবেদন?' জানতে চাইলেন ঈশান।

সেমন্তী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি জানি আপনার অনেক ক্ষমতা। নইলে মনের কথা পড়তে পারতেন না। দেখুন না আমাদের জন্য কিছু করতে পারেন কিনা? ছেলে বা মেয়ে, যে-কোনো কিছু একটা হলেই হবে। কত চেষ্টা করছি, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যখন দেখি তখন বুক ফেটে যায়। মনে হয় আমারও এমন যদি কেউ থাকত। আত্মীয়-স্বজন আমাকে আকারে ইঙ্গিতে বাঁজা বলে খোঁটা দেয়।'—এই বলে থামল সে। সকালের সূর্যালোকে সেমন্তীর চোখের কোলে জল চিকচিক করে উঠল। পর্ণাভর মতো ঈশানেরও সম্ভবত তা নজর এড়াল না।

সেমন্তীর মুখের দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তিনি বললেন, 'তোমার মনের ব্যথা আমি বুঝতে পারছি। সত্যি কথা বলতে কি কাল রাতে আমিও এটা নিয়ে ভাবছিলাম। কিছু ক্ষমতা যখন আছে তখন সেটা যদি তোমাদের কাজে লাগে। আমার তো কেউ নেই। ক্ষমতাটা কাজে লাগালে যদি ভবিষ্যতে আমাকে মনে রাখো তোমরা। হ্যাঁ, কাজটা আমি করতে পারি। শুধু সন্তান নয় পুত্র সন্তান লাভ করবে তোমরা। যদি তোমার বা তোমার স্বামীর আপত্তি না থাকে তবে সে কাজে নামতে

পারি আমি। তোমাদের সাহায্যও লাগবে। এ বাড়িতেই কাজটা করব আমি। বাড়ির সামনের জায়গাটাতে।'

পর্ণাভ জানতে চাইল, 'কেমন কাজ? কী করতে হবে?'

তেমন কিছু না। আমার সঙ্গে মধ্যরাতে হোম আর পূজাপাঠে বসতে হবে তোমার স্ত্রীকে। তবে হ্যাঁ, সেখানে তৃতীয় কারো উপস্থিত থাকা চলবে না। এ কাজের আসল জিনিসগুলো অবশ্য আমিই জোগাড় করে নেব। তবে তোমার বউয়ের জন্য একটা লাল পেড়ে শাড়ি আর দশকর্মার কিছু জিনিস কিনে আনতে হবে।'

কথাটা শুনে সেমন্তী বলে উঠল, 'না, না, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

পর্ণাভও ব্যাপারটার মধ্যে তেমন আপত্তিকর কিছু খুঁজে পেল না। পঁচাত্তর বছরের বড় জ্যাঠামশাই নিশ্চয়ই মধ্যরাতে ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রীকে একলা পেয়ে জাপটে ধরার মানুষ নন। পর্ণাভ তাই বলল, 'কবে কাজটা করবেন আপনি? ফর্দ করে দিন। জিনিসগুলো কিনে আনব।'

ঈশন বললেন, 'কাল মঙ্গলবার। শুভ দিন। কালই বসব তবে। তবে আজকে বাজারে গিয়ে লাভ নেই। সোমবার বাজার বন্ধ থাকে। কাল সকালে বেরিয়ে কেনাকাটা কোরো।'

সেমন্তী বলল, 'আমাকে কোনো নিয়ম মানতে হবে কি?'

ঈশান চক্রবর্তী জবাব দিলেন, 'না, তোমার কিছু মানার দরকার হবে না। যা খুশি খেতেও পারো। শুধু আসনে বসার আগে স্নান সেরে, নতুন বস্ত্র পরিধান করে বলতে হবে। যা মানার আমিই মানব যজ্ঞের পুরোহিত হিসাবে।' কথাগুলো বলে তিনি বললেন, 'তাহলে এবার আমি যাই। আমার কিছু কাজ আছে।'

ঈশান চলে গেলেন অন্য দিকে। দোতলায় উঠে এল পর্ণাভরা। এবার বেশ খুশি খুশি লাগছে সেমন্তীকে। সে বলল, 'হয়তো এ ব্যাপারটার জন্যই ভগবান আমাদের এখানে টেনে এনেছেন। নইলে আমরা হঠাৎ এখানে এলাম কেন? ঠাকুর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন।'

পর্ণাভ তার কথার জবাবে কোনো উত্তর দিল না। এসব করে যদি সেমন্তী শান্তি পায় তো পাক।

রান্না, গল্পগুজব করে খেয়েদেয়ে বাকি দিনটা কেটে গেল। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে একবার বাগানে ঘুরে এল তারা। সন্ধ্যা নামার কিছু পরে খড়মের শব্দ শোনা গেল তাদের দরজার সামনে তারা। ঈশান এসে দাঁড়ালেন ঘরের সামনে। সেমন্তী বলল, 'আসুন আসুন ভিতরে আসুন।'

ঈশান বললেন, 'না, ঘরে ঢুকব না। আমি কালকের প্রস্তুতির জন্য কিছু কাজ সারব। ফর্দটা দিতে এলাম।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পর্ণাভর হাতে ফর্দটা ধরিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন ঈশান। লাল কালিতে লেখা ফর্দটা একবার মোমের আলোতে দেখল পর্ণাভ। কিছু চেনা, কিছু অজানা দশকর্মার জিনিস।

গত রাতের মতোই লুডো খেলে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিল তারা। তারপর খাওয়া সেরে রাত দশটায় বিছানাতে শুয়ে পড়ল।

ঘণ্টা খানেক বাদে পর্ণাভর ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গেল। পাশ ফিরে হঠাৎ সে খেয়াল করল সেমন্তী বিছানাতে নেই। ঘরের দরজাটা খোলা। সেমন্তী কি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে? মিনিট পাঁচেক পর যখন সেমন্তী ফিরল না তখন টর্চ হাতে খাট থেকে নামল পর্ণাভ। সে খেয়াল করল জানলাটাও খোলা। কিন্তু তার যতদূর খেয়াল হল জানলাটা সে শোবার আগে বন্ধ করেছিল। খোলা জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরে। পর্ণাভ এগিয়ে গেল জানলাটা বন্ধ করার জন্য। আর তখনই সে দেখতে পেল সেমন্তীকে! সেই নিশীথ হরীতকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে সেমন্তী!

ব্যাপারটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সামনের বারান্দা হয়ে পিছনের বারান্দাতে হাজির হল। ওপর থেকে সেমন্তীর ওপর টর্চের আলো ফেলে সে বলল, 'তুমি ওখানে কী করছ? চলে এসো।'

টর্চের আলোতে মনে হয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সেমন্তীর। সে একটা হাত দিয়ে চোখটা আড়াল করল। তা দেখে পর্ণাভ আলোটা নিভিয়ে দিল। তার ডাকে সেমন্তী গাছতলা ছেড়ে আবার বাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করল। পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠে আসতেই পর্ণাভ বিস্মিত ভাবে বলল, 'ওখানে গেছিলে কেন?'

জড়ানো গলাতে সেমন্তী জবাব দিল, 'জানলা দিয়ে আবার দেখতে পেলাম গাছের নীচে সেই মহিলাকে! ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য গেলাম, কিন্তু কেউ নেই!'

কথাটা শুনে পর্ণাভ ভর্ৎসনার স্বরে বলল, 'তোমার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? কোনো ডালের ছায়াটায়া পড়ে কী দেখতে কী দেখেছ! তার জন্য এত রাতে ছুটে গেছ ওখানে! যত্তসব উদ্ভট ব্যাপার!

সেমন্তী শুধু ঘুম জড়ানো গলাতে বলল, 'এবার খুব ঘুম পাচ্ছে, ঘরে চলো।'

ঘুরে ঢুকে ভালো করে দরজা জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল তারা।

৫

সকালবেলা সেমন্তীর আলতো ধাক্কাতে উঠে বসল পর্ণাভ। সেমন্তী চায়ের কাপটা হাতে ধরিয়ে পর্ণাভকে বলল, 'তোমাকে আজ সিউড়ি বাজার যেতে হবে তো জিনিসগুলো আনতে। তাড়তাড়ি যাও। তাড়াতাড়ি ফিরো।'

সেমন্তীর গলার স্বরটা কেমন যেন ভাঙা ভাঙা লাগছে! চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে পর্ণাভ বলল, 'তোমার গলা ভেঙেছে নাকি?'

সেমন্তী আধ ভাঙা গলাতে উত্তর দিল, 'সকালে উঠে তাই তো দেখছি।'

পর্ণাভ মৃদু রাগত স্বরে বলল, 'হবে না! তোমাকে নিষেধ করলাম, অভ্যাস নেই, ঠান্ডা কুয়োর জলে স্নান কোরো না। তুমি আমার কথা শুনলে না। তার ওপর কাল রাতে কী না কী দেখার জন্য শীতের রাতে চাদর ছাড়া গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালে। সবেতেই তোমার ওস্তাদি। এবার সামলাও! নির্ঘাত ঠান্ডা লেগেছে!'

সেমন্তী তার কথার কোনো জবাব দিল না। যা হবার তা হয়েছে। সাত সকালে আর বউকে বকাঝকা করল না সে। সেমন্তীকে সে বলল, 'কিট ব্যাগে ঠান্ডা লাগার ওষুধ আছে খেয়ে নাও। দ্যাখো ঠিক হয় কিনা! আর একটু গার্গেল করে নাও।'

চা খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিল পর্ণাভ। বেরোবার আগে সে সেমন্তীকে বলল, 'ভাবছি একটা হুইস্কি আনব। বহু দিন খাওয়া হয়নি। এমন ফাঁকা নিরিবিলি জায়গাতে একটু পান করতে ইচ্ছা করছে অন ইওর কাইন্ড পারমিশন।'

সেমন্তী সম্মতিসূচক হাসল। তারপর ভাঙা ভাঙা গলাতে বলল, 'দেখো তো বাজারে শোল মাছ পাওয়া যায় কিনা? অনেকদিন খাইনি।'

পর্ণাভ বুঝতে পারল পরশু রাতে বড় জ্যাঠার হাতে শোল মাছ দেখে তার শোল মাছ খাবার ইচ্ছা হয়েছে। আর তারপরই তার মনে পড়ে গেল গতকাল সকালে নিশীথ হরীতকী গাছের নীচে দেখা পিঁপড়ে ধরা পোড়া শোল মাছের মাথাটার কথা। ব্যাপারটা সে বলতে গিয়েও বলল না সেমন্তীকে। কথাটা শুনে পাছে ঘেন্নাতে সেমন্তীর শোল মাছ খাবার ইচ্ছা চলে যায় সেজন্য। সে বলল, 'পেলে নিয়ে আসব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে পর্ণাভ যখন তার গাড়ির দিকে এগোচ্ছে তখন সে বড় জ্যাঠামশাইকে দেখতে পেল। বাড়ির এক পাশে বারান্দা লাগোয়া কুয়োটা যেখানে আছে সেখানে একটা বড় তালপাতা হাতে বড় জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখতে পেয়ে পর্ণাভ হেসে জানতে চাইল, 'কী করছেন?'

ঈশান বললেন, 'এ জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করব। রাতে এখানেই কাজটা হবে।'

পর্ণাভ বলল, 'আচ্ছা, আমিও ফর্দর জিনিসগুলো কিনতে যাচ্ছি।' কথাগুলো বলে গাড়িতে উঠে বসল সে।

সিউড়ির বাজার বেশ বড়। সেখানে গিয়ে প্রথমে দশকর্মা আর কাপড়ের দোকান থেকে শাড়িটা কিনে ফেলল সে। মদের দোকানও আছে। হুইস্কি কিনতেও অসুবিধা হল না। তারপর শাক-সবজি আর কিছু বাজার করে মাছের বাজারে ঢুকে সৌভাগ্যক্রমে একটা ছোট শোল মাছও পেয়ে গেল। কেনাকাটা সেরে বেলা দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরল পর্ণাভ। জিনিসগুলো দিতে হবে বড় জ্যাঠামশাইকে। বেরোবার সময় পর্ণাভ সেখানে বড় জ্যাঠামশাইকে দেখেছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখল যে জায়গাটা ঝকঝকে পরিষ্কার করে সম্ভবত গোবরজল লেপা হয়েছে। মাটির ওপর কোমর সমান উঁচু কুয়োর দেওয়ালের বাইরেটাও ঘসে মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। তবে তিনি সেখানে নেই। অবশ্য এর পরেই পর্ণাভ দেখতে পেলেন তাকে। বাড়ির পিছন থেকে একরাশ কাঁচা পাতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি। পর্ণাভ তার হাতে দশকর্মা আর শাড়ির প্যাকেটটা দিয়ে পাতাগুলো দেখে জানতে চাইল, 'এসব পাতা দিয়ে কী হবে?'

ঈশান জবাব দিলেন, 'রক্ত চন্দনের পাতা দিয়ে মালা বানাব। ঘোড়া নিম, অশ্বত্থ আর বহড়ার পাতা সেলাই করে আসন বানাব। ঠিক রাত বারোটাতে তোমার স্ত্রীকে নীচে নামিয়ে আনব আমি। শেষ

রাতে আবার ঘরে পৌঁছে দেব। তারপর তোমরা মিলিত হবে। আর তোমাকে একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ আর কেশর মিশ্রিত দুধ দেব। সেটা পান করবে আমি যখন বউমাকে আনতে যাব তার পরেই। কথাগুলো তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।' কথাগুলো বলে জিনিসপত্র নিয়ে একতলার একটা ঘরে চলে গেলেন ঈশান। অন্য একটা ব্যাগের মধ্যে রাখা বাজার, মাছ আর মদের বোতল নিয়ে পর্ণাভ ওপরে উঠে এল। ঘরে ঢুকে বোতলটা বার করে ব্যাগটা সেমন্তীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে পর্ণাভ বলল, 'এই নাও শোল মাছ পেয়েছি। আর কিছু কাঁচা সবজি, আনাজও আছে।'

কথাটা বলে হাসি ফুটে উঠল সেমন্তীর ঠোঁটে। সে বলল, 'কত দিন পর শোল মাছ খাব!'

সেমন্তীর গলাটা আরও বেশি ভাঙা শোনাল এবার। পর্ণাভ জিগ্যেস করল, 'ঠান্ডা কমার ওষুধটা খেয়েছ?'

ভাঙা গলায় সেমন্তী কী একটা বলল তা বুঝতে পারল না পর্ণাভ। বহুদিন পর হুইস্কির বোতলটা হাতে পেয়ে তার যেন আর সেটা খোলার জন্য তর সইছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ভিতরের বারান্দাতে গ্লাস, বোতল, চানাচুর সব সাজিয়ে নিয়ে বসল পান করার জন্য। ঘরের ভিতর থেকে বাসনপত্রের শব্দ শুনে পর্ণাভ বুঝতে পারল ওদিকে সেমন্তীও রান্না করতে বসল। মদ্যপান শুরু করল পর্ণাভ।

অনেকদিন পর মদ্যপান করে বেশ একটা ঝিমুনি ভাব এসে গেছিল পর্ণাভর। ঘণ্টা তিনেক বাদে বেলা একটা নাগাদ কিছু একটা পোড়ার তীব্র গন্ধ আর একটা মিহি শব্দে হুঁশ ফিরল তার। মাছ পোড়ার কটু গন্ধ আর বিড়ালের ডাক। বারান্দা থেকে উঠে ঘরের দিকে এগোল সে। দরজার বাইরে একটা সাদা বিড়াল বসে ঘরের ভিতর তাকিয়ে 'মিউ মিউ' করে ডাকছে। পোড়া মাছের গন্ধেই সম্ভবত কোথা থেকে সে হাজির হয়েছে। পর্ণাভকে দেখে বিড়ালটা একটু সরে গেল। পর্ণাভ ঘরে ঢুকে দেখল স্টোভের ওপর একটা সসপ্যানে শোল মাছের টুকরোগুলো পুড়ছে। উৎকট গন্ধ আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে তার থেকে। ঠিক যেমন সেদিন রাতে বড় জ্যাঠামশাইয়ের ঘর থেকে গন্ধ ভেসে আসছিল। আর স্টোভের কিছুটা তফাতে চোখ বুজে আছে সেমন্তী। ব্যাপারটা দেখে পর্ণাভ বলে উঠল, 'তুমি ঘুমাচ্ছ! এদিকে মাছ পুড়ে ঝামা হয়ে গেল!'

চোখ খুলে তাড়াতাড়ি উঠে স্টোভের নবটা বন্ধ করল সেমন্তী। সসপ্যানটাও সে এক পাশে নামিয়ে রাখল। ধোঁয়াটা একটু কমলে মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে পর্ণাভ বলল, 'এ মাছ আর খাওয়া যাবে না। মনে হয় তেলও তো দাওনি! বিড়াল এসেছে। ওকে দিয়ে দাও।'

সেমন্তী ভাঙা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তেল দেওয়া হয়নি। ভুলে গেছি। তুমি স্নান করে নাও। অন্য রান্না হয়ে গেছে।'

সেমন্তী মনে হয় আজ রাতের ব্যাপারটা ভেবে সব ভুলে যাচ্ছে। শোল মাছ অবশ্য পর্ণাভর নিজের খুব একটা পছন্দের নয়। সে আর কিছু বলল না সেমন্তীকে।

পর্ণাভ স্নান সেরে আসার পর সেমন্তী বলল, 'তুমি আগে খেয়ে নাও। তারপর আমি খাচ্ছি।'

পর্ণাভ খেতে বসল। ভাত খাওয়া শেষ হবার পর হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে পর্ণাভ দেখল সেই পোড়া মাছের সসপ্যানটা টেনে নিয়ে বসেছে সেমন্তী! পর্ণাভ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'ও দিয়ে তুমি কী করবে?'

সেমন্তী ভাঙা গলাতে বলল, 'এত টাকা দামের মাছ! দেখি না খাওয়া যায় কিনা!' এই বলে সে মাছের পোড়া মাথাটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে একটু চিবিয়ে বলল, 'ভালোই লাগছে কিন্তু। অনেক দিন পর শোল মাছ খাচ্ছি।'

পর্ণাভর হঠাৎ মনে পড়ে গেল গাছের নীচে পিঁপড়ে ধরা সেই শোল মাছের মাথাটার কথা। সে কথা মনে পড়তেই গাটা কেমন ঘিনঘিন করে উঠল তার। মাথাটা চিবিয়ে আর একটা পোড়া মাছের টুকরো তুলে নিল সেমন্তী। শরীরটা কেমন গুলিয়ে ওঠাতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল পর্ণাভ। দরজার বাইরে মাছের আশাতে তখন আবার বিড়ালটা এসে দাঁড়িয়েছে।

সামনের বারান্দা হয়ে আবার পিছনের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল পর্ণাভ। সে এবার দেখতে পেল বড় জ্যাঠামশাইকে। সেই নিশীথ হরীতকী গাছের নীচে তিনি। হাতে একটা লগি। গাছের নীচ থেকে তিনি কী যেন একটা কুড়িয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। পর্ণাভকে তিনি খেয়াল করলেন না। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর পর্ণাভ যখন ঘরে ফিরে এল তখন সেমন্তী পুরো মাছটাই শেষ করে ফেলেছে। পর্ণাভর দিকে তাকিয়ে সে হেসে বলল, 'বেশ খেলাম কিন্তু।' তার গলা এখন এতটাই ভাঙা যেন মনে হয় অন্য কারো গলা! পর্ণাভ হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ফিস তন্দুরি খেলে! কথাটা বলে তক্তপোষে শুয়ে পড়ল সে।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠল পর্ণাভ। কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে সেমন্তী। তাকে রাত জাগতে হবে। তাই তাকে আর ডাকল না। ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নেমে এল পিছনের বাগানে। বেলা পড়ে আসছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে সে পৌঁছে গেল নিশীথ হরীতকী গাছের নীচে। একটা ছোট ডাল আর কিছু পাতা পড়ে আছে মাটিতে। ওপর দিকে তাকিয়ে সে সেই হরীতকীটা দেখতে পেল না। তার মনে হল ওই ডালটাই মাটিতে পড়ে আছে। তবে কি হরীতকীটা পেড়ে নিয়েছেন জ্যাঠামশাই? এরপর কিছুক্ষণ বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়াল সে। তারপর যখন সন্ধ্যা নামতে শুরু করল তখন সে বাগান ছেড়ে ফেরার পথ ধরল। ঘরে ঢুকে সে দেখল সেমন্তী তখনও ঘুমাচ্ছে। মোম না জ্বালিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ল সেমন্তীর পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে।

৬

শুয়ে পড়লেও জেগেই ছিল পর্ণাভ। রাত আটটা নাগাদ বিছানাতে উঠে বসল সেমন্তী। পর্ণাভ বিছানা থেকে নেমে মোম জ্বালিয়ে তাকাল সেমন্তীর দিকে। চোখ দুটো কেমন যেন লাল মনে হচ্ছে তার। মুখটাও ফোলা ফোলা। পর্ণাভ তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার শরীর কেমন?'

সেমন্তী জবাব দিল, 'ঠিক আছে। তবে আমি আর রাতে খাব না। শোল মাছ খেয়ে পেট ভরে গেছে।'

পর্ণাভ জবাব দিল, 'ঠিক আছে! কিন্তু তোমার গলা তো পুরো ভেঙে গেছে গো! মনে হচ্ছে অন্য মানুষের গলা! তার ওপর চোখও লাল দেখাচ্ছে! ঠান্ডা তো লাগিয়েছ বোঝা যাচ্ছে! এ অবস্থায় যজ্ঞে বসবে কীভাবে? আর স্নান করলে তো নির্ঘাত নিমুনিয়া হবে! বড় জ্যাঠামশাইকে বলি, আজ এসব থাক। তেমন হলে নয় বড় জ্যাঠামশাইয়ের কথামতো কোনো একটা দিন দেখে আবার আমরা এখানে আসব।'

পর্ণাভর কথাটা শুনেই সোজা হয়ে বসল সেমন্তী। তারপর বলল, 'না, আজই বসব আমি। কিছু হবে না আমার। এই আমার শেষ সুযোগ। বাধা দিয়ো না। বাধা দিলেও আমি শুনব না।'

সেমন্তী শেষ কথাগুলো এমন শক্ত ও রুক্ষ ভাবে বলল তাতে বেশ অবাক হয়ে গেল পর্ণাভ। সেমন্তী বেশ নরম স্বভাবের মেয়ে। এই সেমন্তীকে যেন বেশ অচেনা বলে মনে হল পর্ণাভর। সে একটু আহত ভাবে বলল, 'আচ্ছা, যা ইচ্ছা তাই করো। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হবে মনে হচ্ছে।'

সেমন্তী তার কথার কোনো জবাব দিল না। যেন সে একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে!

জানলার সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল পর্ণাভ। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাগানে। নিশীথ হরীতকী গাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অন্য গাছগুলো। অশ্বত্থ, বহরা, ঘোড়া নিম, শ্বেত খাদির। চাঁদের আলোতে তাদের কেমন যেন জীবন্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছে। হরীতকী গাছটাকে ঘিরে ধরে কী যেন বলছে তারা। বাড়ির সামনের অংশ থেকে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট শব্দও যেন ভেসে আসছে। বড় জ্যাঠামশাই হয়তো তার যজ্ঞের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তারই শব্দ এসব। সময় এগিয়ে চলল।

পুরোনো মোমবাতিটা শেষ হয়ে এসেছিল। নতুন একটা বড় মোম জ্বালিয়ে রাত এগারোটা নাগাদ রাতের খাওয়া সেরে নিল পর্ণাভ। ঘরের বাইরে বিড়ালটা আবার হাজির হয়েছে। রুগ্ন বিড়াল। এই পোড়ো বাড়িতে খাবারের লোভে আবার এসেছে সে। উচ্ছিষ্টগুলো তাকে দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে পর্ণাভ যখন ঘরে ঢুকল তখন সেমন্তী বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পর্ণাভর উদ্দেশে সে বলল, 'তুমি কোনো চিন্তা কোরো না।' কথাটা বলে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাইরের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এই নিশীথ হরীতকী গাছটা কী সুন্দর তাই না?'

সেমন্তীর ব্যবহারে পর্ণাভর বেশ একটু অভিমান হয়েছে। তাই সে তার কথার কোনো জবাব দিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেমন্তী।

ঠিক রাত বারোটাতে পর্ণাভর ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলেন বড় জ্যাঠামশাই ঈশান চক্রবর্তী। তার এক হাতে একটা লণ্ঠন আর অন্য হাতে একটা মাটির গ্লাসের মতো পাত্র। তাকে দেখে পর্ণাভ দরজার সামনে এগিয়ে গেল। আর তার পিছনে সেমন্তীও। তাকে দেখে পর্ণাভ বুঝতে পারল, সদ্য স্নান সেরে এসেছেন তিনি। তার শুভ্র দাড়ির ডগা থেকে এখনও জল ঝরছে। দুধ পূর্ণ মাটির গ্লাসটা পর্ণাভর হাতে দিয়ে তিনি বললেন, 'এবার বউমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। ওই দুধটা খেয়ে শুয়ে পড়ো তুমি। ঘর থেকে বেরিয়ো না। যজ্ঞস্থলে তৃতীয় কারো উপস্থিতি থাকতে নেই। তবে সব মাটি হয়ে যাবে।'

দুধের পাত্রটা হাতে নিয়ে বলব না বলব না করেও শেষ পর্যন্ত কথাটা, বড় জ্যাঠামশাইকে উৎকণ্ঠিত ভাবে বলেই ফেলল পর্ণাভ। সে বলল, 'খুব ঠান্ডা লেগেছে সেমন্তীর। গলা ধরে গেছে, কথা বলতে পারছে না। এই ঠান্ডার মধ্যে স্নান করলে আবার বিপত্তি না হয়!' কথাটা শুনে ঈশান বললেন, 'ও তাই নাকি! তবে মাথায় একটু জল ছিটিয়ে নিলেই হবে। আর মন্ত্রোচ্চারণ মনে মনে করলেই হবে।' পর্ণাভ হয়তো এরপর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে টেনে পাশে সরিয়ে দিয়ে বড় জ্যাঠামশাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সেমন্তী। তারপর ইশারাতে বড় জ্যাঠামশাইকে বলল, 'চলুন।'

দরজা ছেড়ে ঈশান তাকে নিয়ে এগোলেন নীচে নামার জন্য।

তারা চলে যাবার পর পর্ণাভ মাটির পাত্রটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। তখনই দুধটা খেতে ইচ্ছা করল না তার। বিছানাতে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসতে চাইল না তার। বিছানাতে বসে কেবলই এপাশ-ওপাশ করতে করতে সে ভাবতে লাগল এত শরীর খারাপ নিয়ে ঠান্ডার মধ্যে সম্ভবত খোলা আকাশের নীচে বসে আছে সেমন্তী। নির্ঘাত অসুস্থ হয়ে পড়বে সে! ক্রমশ এগিয়ে চলল সময়। একঘণ্টা, দু-ঘণ্টা...

রাত দুটো নাগাদ হঠাৎই একটা ঠক করে শব্দ শুনে কম্বল ছেড়ে বিছানাতে উঠে বসল পর্ণাভ। মোমটা জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে দপদপ করছে। সেই আলোতে পর্ণাভ দেখল সেই বিড়ালটা কখন যেন ঘরে ঢুকে বসেছিল। দুধের ভাঁড়টা সে উল্টে দিয়ে মাটি থেকে দুধ চেটে চেটে খাচ্ছে। খাচ্ছে খাক। বড় জ্যাঠামশাই যা করছেন বা করতে বলেছেন তাতে পর্ণাভর কোনো বিশ্বাসই নেই। শুধু মাত্র সেমন্তীর বিশ্বাসকে আঘাত না করার জন্য, তাকে শান্তি দেবার জন্য বড় জ্যাঠামশাইয়ের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে পর্ণাভ।

সে বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে তার দুধ চাটা দেখতে লাগল। আর তারপরই হঠাৎ মোমবাতিটা নিভে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে বসে পর্ণাভ যেন আরও অস্থির হয়ে উঠল। নানা কথা ভাবতে ভাবতে সেমন্তীর জন্য কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কা কাজ করতে লাগল তার মনে। এক সময় সে ভাবল বড় জ্যাঠামশাই যাই বলুন না কেন নীচে নেমে সে আড়াল থেকে দেখবে সেমন্তী কী করছে?—এ কথা ভেবে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে ঘরের বাইরে বেরোল পর্ণাভ। পিছনের বারান্দা দিয়ে নীচে বাগানে নেমে সন্তর্পণে সে এগোল যেদিকে তাদের থাকার কথা সেদিকে।

কুয়োটা দেখতে পেল পর্ণাভ। তার ওপাশে যেন আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। ওর আড়ালে বসে ব্যাপারটা দেখা যেতে পারে ভেবে সন্তর্পণে সেদিকে এগোল। তারপর মার্জার পায়ে গুঁড়ি মেরে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে কুয়োর প্রাচীরের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল।

পর্ণাভ সামনে তাকালো। কুয়ো থেকে হাত কুড়ি পঁচিশ দূরে একটা যজ্ঞকুণ্ডের দু-পাশে মুখোমুখি বসে আছে তারা দুজন। আগুনের আভাতে পাশ থেকে দুজনের মুখ দেখা যাচ্ছে। সেমন্তীর পরনে নতুন লাল পেড়ে শাড়ি, পিঠে এলিয়ে আছে খোলা চুল।

বড় জ্যাঠামশাইয়ের পরনে একখণ্ড রক্তবস্ত্র। ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত। পাতার সামনে বসে বেশ জোরে জোরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন তিনি। আর মাঝে মাঝে অগ্নিকুণ্ডে কী সব যেন ছোটাচ্ছেন পাশ

থেকে তুলে তুলে। মাটির পাত্রে, কলাপাতার টুকরোতে নানা উপাচার সাজানো আছে তার চারপাশে। ভালো করে তাকিয়ে একটা কলাপাতার ওপর সেই কালচে সবুজ রঙের ফলটাকেও দেখতে পেল পর্ণাভ। নিশীথ হরীতকী!

কুয়োর আড়ালে বসে ব্যাপারটা দেখতে লাগল পর্ণাভ। সেমন্তী পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। হয়তো সে মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করছে—ভাবল পর্ণাভ। সময় এগিয়ে চলল।

একসময় পর্ণাভ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত তিনটে বেজে গেছে। অনেক সময় কেটে গেছে। এদিকে যজ্ঞের আগুনটাও কেমন যেন নিবু নিবু হয়ে এসেছে। বেশ স্তিমিত হয়ে এসেছে বড় জ্যাঠামশাইয়ের কণ্ঠস্বর। এবার নিশ্চয় কাজ শেষ হবে। বড় জ্যাঠামশাই, সেমন্তীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসার আগেই এ জায়গা থেকে উঠে পর্ণাভকে ঘরে ফিরতে হবে।

সেখান থেকে উঠতে যাচ্ছিল পর্ণাভ। ঠিক সেই সময় কেমন যেন একটা অস্পষ্ট খচমচ শব্দ শুনল সে। পিছনে, আশেপাশে তাকিয়ে তেমন কিছু চোখে পড়ল না তার। কিন্তু এরপরই আবারও শব্দটা কানে গেল তার। পর্ণাভর এবার মনে হল শব্দটা যেন কুয়োর ভিতর থেকেই আসছে। কুয়োর ভিতর দেওয়ালের গা বেয়ে যেন উঠে আসছে কিছু একটা। হ্যাঁ, আবার সেই খচমচ শব্দ!

পর্ণাভ শব্দটার দিকে মনোযোগ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বড় জ্যাঠামশাইয়ের গলার শব্দে সে আবার সামনের দিকে তাকাল। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তারা দুজনেই। বড় জ্যাঠামশাইয়ের এক হাতে পাতার মালা অন্য হাতে কলাপাতাতে রাখা নিশীথ হরীতকী ফলটা।

ঈশান, সেমন্তীকে বললেন, 'এই রক্ত চন্দনের মালাটা গলায় ধারণ করো। তারপর এই নিশীথ হরীতকী ফলটাকে নিয়ে ও কুয়োর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। আমি বললে ফলটাকে কুয়োর জলে বিসর্জন দেবে।'

সেমন্তী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তার কথা শুনে।

ঈশান, মালা আর ফলটা তুলে ধরে আবারও বললেন, 'নাও থালাটা আর ফলটা নাও। দেরি কোরো না। তিথি পেরিয়ে যাবে। নিশীথ হরীতকী তোমাকে বিসর্জন দিতে হবে।'

বড় জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনে সেমন্তী এবার বলে উঠল, 'কাকে বিজর্সন দেব? শুধু ফলটা, নাকি তার সঙ্গে নিজেকেও?' সেমন্তীর কণ্ঠস্বরটা এবার স্পষ্টতই যেন অন্য কারো কণ্ঠস্বর বলে মনে হল পর্ণাভর।

বড় জ্যাঠামশাই যেন মৃদু চমকে উঠে বললেন, 'তার মানে?'

সেমন্তীর ঠোঁটে যেন মৃদু হাসি ফুটে উঠতে শুরু করেছে। সে বলল, 'আপনি এতক্ষণ যে মন্ত্র পাঠ করছিলেন সে তো সন্তান ধারণের মন্ত্র নয়। পাতাল বটুকের আবাহন মন্ত্র।'

তার গলা শুনে পর্ণাভর এবার আর কোনো সন্দেহই রইল না। এ গলা সেমন্তীর নয়, অন্য কারো গলা।

তান্ত্রিক ঈশান চক্রবর্তী বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন, 'তুমি কে?'

তাদের কথা শুনতে শুনতে পর্ণাভর মনে হল সেই খচমচ শব্দটা যেন কুয়োর ভিতর থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে!

বড় জ্যাঠামশাইয়ের প্রশ্নের জবাবে একটু চুপ করে থেকে সেমন্তী বলল, 'আমার গলা শুনেও এখনও ঠিক চিনতে পারছ না আমাকে! ভেবেছিলে পোড়া শোল মাছ খাইয়ে শান্ত রাখবে আমাকে। তোমার ও মাছ ছুঁয়েও দেখিনি। আমি সে, যার মাথা কেটে তুমি তার খুলির মধ্যে মাটি ভরে নিশীথ হরীতকীর চারা পুঁতেছিলে। এবার চিনতে পারছ আমাকে?'

তার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বড় জ্যাঠামশাই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন, 'তারাসুন্দরী!' বলে। তার হাত থেকে খসে পড়ল রক্তচন্দন পাতার মালা আর নিশীথ হরীতকী!

অট্টহাস্য শুরু করল সেমন্তীর গলা থেকে বেরিয়ে আসা সেই অচেনা বীভৎস স্বর। আর তারপর সে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল বড় জ্যাঠামশাইকে। বাঁচার জন্য ঈশান ছুটলেন কুয়োর পাশ দিয়ে বাগানের বাইরে পালাবার জন্য। আর ঠিক সেই সময় খচমচ শব্দটা প্রবল হয়ে উঠল। জ্যাঠামশাই যখন ঠিক কুয়োর গায়ে এসে পড়েছেন ঠিক সেই সময় কুয়োর ভিতর থেকে বাদুড়ের ডানার মতো দুটো কালো চাদরের পর্দা যেন হাতের মতো বেরিয়ে এল! পুঁতিগন্ধময় সেই কালো চাদর দুটো আঁকড়ে ধরল ধাবমান বড় জ্যাঠামশাইকে। তারপর নিমেষের মধ্যে বড় জ্যাঠামশাইয়ের শরীরটাকে আবৃত করে অচেনা, অজানা আতঙ্ক অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়োর ভিতর! সেই বামা কণ্ঠস্বর প্রবল অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'নিয়ে গেল! নিয়ে গেল!'—এ কথা বলে সে ছুটতে শুরু করল বাগানের দিকে।

প্রাথমিক বিস্ময়, বিহ্বলতা আতঙ্ক কাটিয়ে পর্ণাভ এরপর ছুটল তার পিছনে। সেই নিশীথ হরীতকী গাছের নীচে গিয়ে পড়ে গেল সেমন্তী। পর্ণাভ যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছালো তখন সংজ্ঞাহীন সেমন্তী। পর্ণাভ তার কাছে পৌঁছে কাঁধ ধরে ঝাঁকাতেই সেমন্তী চোখ মেলে উঠে বসল। তারপর বিস্মিত ভাবে চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'এখানে আমি কীভাবে এলাম?' সেমন্তীর কণ্ঠস্বর এখন আর ভাঙা নয়, অপরিচিত নয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কোনোরকমে তাকে দোতলার ঘরে উঠিয়ে নিয়ে এল পর্ণাভ।

ভোরের আলো ফুটল একসময়। ততক্ষণে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলেছে পর্ণাভ। এ বাড়ি যথাসম্ভব দ্রুত ছাড়তে হবে তাকে। পর্ণাভ, সেমন্তীর সঙ্গে যতটুকু কথাবার্তা বলেছে তাতে সে বুঝতে পেরেছে পরশু রাতে যে সে নিশীথ হরীতকী গাছের তলাতে গিয়েছিল এরপর তার কিছুই মনে নেই। ঘরে ফেরা, শোল মাছ খাওয়া, যজ্ঞে বসা, কিছুই মনে নেই। পর্ণাভ তার কাছে কিছুই ভাঙল না। শুধু তাকে জানাল দ্রুত এ বাড়ি ছাড়তে হবে তাদের।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই মালপত্র নিয় তারা নীচে নেমে এল। যজ্ঞস্থলে পড়ে আছে গতকালের নানা উপাচার। সে সব দেখে কিছুই মনে করতে পারল না সেমন্তী। মালপত্র গাড়ির ডিকিতে ওঠাবার পর গাড়িতে উঠে বসল সেমন্তী। পর্ণাভ গাড়িতে ওঠার সময় হঠাৎই দেখতে পেল কিছুটা তফাতে মরে পড়ে আছে সেই বিড়ালটা। কাক ঠোকরাচ্ছে তাকে। তবে কি বিষ মেশানো ছিল

সেই দুধে? পর্ণাভ আর সেমন্তী, দুজনেরই কোনোদিন আর হদিশ পাওয়া যেত না? কেঁপে উঠল পর্ণাভ। গাড়িতে উঠে বসে এঞ্জিন স্টার্ট করতেই সেমন্তী বলল, 'বড় জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হতো না?'

কথাটা শুনে পর্ণাভ তাকাল কুয়োটার দিকে। তার চোখে মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠল সেই দৃশ্য! দুটো কালো পর্দা বড় জ্যাঠামশাইকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুয়োর অন্ধকারে, পাতালে। ভয়ঙ্কর এক অস্তিত্ব; পাতাল বটুক।

কিছু কথা

পাতাল বটুক দেবতা নয়, প্রেত নয়, উপদেবতা নয়, মানুষ নয়, এক অন্য অস্তিত্ব। কেউ কেউ বলেন ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব! স্থান, কাল, দেশ ভেদে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় তাদের। নির্দিষ্ট কোনো চেহারার বর্ণনাও নেই তাদের। সুড়ঙ্গ বা কূপের ভিতর থেকে পাতাল ছেড়ে উঠে আসে তারা। বিদেশি লেখকদের লেখাতে, আসামেও কিছু লেখকের রচনাতে নানা ভাবে নানা নামে আবির্ভূত তারা। যদিও তাদের নিয়ে লেখা খুব বেশি হয়নি। এ কাহিনি কোনো বিশ্বাস বা ধর্মীয় ভাবনাকে আঘাত করার জন্য নয়। কল্পিত ভাবনা, কল্পিত চরিত্র নিয়ে এ কাহিনি রচনা করা হয়েছে শুধু মাত্র পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জনের জন্য।

মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি

তাঁবু খাটাচ্ছিল ঈশানবাবুর সঙ্গে আসা লোকগুলো। আর তিনি তাকিয়ে দেখছিলেন চারদিকে। অপরূপ কাশ্মীর উপত্যকা। এ জায়গাটা পহেলগাঁওর একটু উপরদিকে পঞ্চাশ মাইল দূরে জনবসতিহীন একটা অঞ্চল। যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই নীল আকাশের বুকে জেগে আছে তুষারশোভিত পর্বতমালা। তার কিরীটগুলো মধ্য গগনের সূর্যালোকে যেন জ্বলছে। আর কাছেপিঠে পাহাড়ের ঢালগুলোতে দাঁড়িয়ে আছে পান্না সবুজ পাইন বন। ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে গেছে গাছগুলো। এখন গ্রীষ্মকাল হলেও মাথার ওপরের শেষ সারির গাছগুলোর গায়ে যে বরফের আস্তরণ আছে তা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

না, ঈশানবাবু সে অর্থে কোনো ট্যুরিস্ট নন, তিনি একজন জিওলজিস্ট, অর্থাৎ একজন ভূতাত্ত্বিক। জিওলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরি করেন। সে সংস্থা থেকেই তাঁকে এ অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে এখানকার মাটি পরীক্ষার জন্য। পহেলগাঁও থেকে স্থানীয় কয়েকজন মানুষকে সঙ্গী হিসাবে জোগাড় করে একটা জিপে কিছুক্ষণ আগেই তিনি এখানে হাজির হয়েছেন। ঈশানবাবুকে দিন তিনেক থাকতে হবে এ জায়গাতে। মাটি পরীক্ষা করতে হবে, নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। আর সেজন্যই তাঁবু খাটানোর কাজ হচ্ছে।

চারপাশ পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ ঈশানবাবুর চোখে পড়ল তাঁর ঠিক সামনেই পাইনবনে ঢাকা যে অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালটা ওপরের দিকে উঠে গেছে, তার মাথার দিকে যেন একটা কাঠামো মতো দেখা যাচ্ছে। ঘর-বাড়ি মতো কিছু একটা। তবে জায়গাটা পাইন গাছে ঘেরা বলে এত দূর থেকে জিনিসটা কী, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। ঈশানবাবুর মনে হল, হয়তো জায়গাটাতে আর্মি আউটপোস্টও থাকতে পারে।

তাঁবু খাটানো হয়ে গেল একসময়। দুটো তাঁবু। একটা তাঁবু ঈশানবাবুর রাত্রিবাসের জন্য। আর বড় তাঁবুতে থাকবে ঈশানবাবুর তিনজন কাশ্মীরি সঙ্গী আর ড্রাইভার। সেও স্থানীয় মানুষ। গাড়ি থেকে ঈশানবাবুর কাজের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালপত্র ইত্যাদি তাঁর তাঁবুতে নিয়ে রাখবার পর ঈশানবাবুর সঙ্গীদের মধ্যে সবথেকে বয়স্ক যে লোকটা, সে এসে দাঁড়াল ঈশানবাবুর সামনে। লোকটার নাম বশির। বৃদ্ধ কাশ্মীরি। তার পরনে স্থানীয় মানুষদের মতোই গরম কাপড়ের তৈরি লম্বা ঝুলের পোশাক বা পিরান, মাথায় কাপড়ের টুপি, একমুখ সাদা দাড়ি।

বশির ঈশানবাবুকে প্রশ্ন করল, 'সাব, আমরা এখন কী করব? কাজ কি এখন থেকেই শুরু হবে?'

ঈশানবাবু জবাব দিলেন, 'না, আজ বিশ্রাম। কাল সকাল থেকে কাজ শুরু হবে। ঘুরে ঘুরে চারপাশের মাটি পরীক্ষা করতে হবে।'

এ কথা বলার পর ঈশানবাবু জানতে চাইলেন, 'এ জায়গাটা নিরাপদ তো? কোনো গোলাগুলির ব্যাপার নেই তো?' কাশ্মীর মানেই তো আজকাল সমতলের মানুষের কাছে গোলা-বন্দুক-জঙ্গি; এসব শব্দ। সমতলের মানুষদের কাছে এসব শব্দের আড়ালে হারিয়ে যেতে বসেছে কাশ্মীরের আসল সৌন্দর্য। যদিও বনেবাদাড়ে নির্জন জায়গাতে কাজ করতে হয় বলে ঈশানবাবুর একটা লাইসেন্সড রিভলবার আছে আত্মরক্ষার জন্য এবং সেটা তিনি সঙ্গে এনেছেন। ঈশানবাবুর মনের ভাব বুঝতে

পেরে বশির হেসে বলল, 'না, সাব। এই মুলুক খুব শান্ত। ওসব ভয় এদিকটাতে নেই। এদিকে কোনো মানুষ থাকে না। যেখানে মানুষ থাকে সেখানেই গন্ডগোল। তা ছাড়া বর্ডারও অনেকটা দূর। বেশ কয়েকটা পাহাড় টপকাতে হয়।'

তার জবাব শুনে আশ্বস্ত হয়ে ঈশানবাবু এরপর প্রশ্ন করলেন, 'পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলগুলোতে নেকড়ে বা অন্য কোনো হিংস্র জানোয়ার আছে নাকি?'

বশির হেসে বলল, 'না, হিংস্র জানোয়ার নেই। তবে এখানে কস্তুরী হরিণ আছে। কস্তুরী হরিণ কাকে বলে তা নিশ্চয়ই জানেন?'

কথাটা শুনে ঈশানবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'জানব না কেন! যদিও চোখে দেখিনি। কস্তুরী মৃগ; মাস্ক ডিয়ার বলে ইংরেজিতে। তাদের নাভিতে সুগন্ধী গ্রন্থি থাকে, তাকে বলে কস্তুরী। খুব দামি জিনিস, সুগন্ধ প্রস্তুতিতে আর অন্য নানা কাজে ব্যবহার হয়। বিশেষত পৌরুষত্ব বাড়াতে নাকি কস্তুরী কাজে লাগে।'

বশির হেসে বলল, 'জি সাব। পুরুষ হরিণের দেহে ওই কস্তুরী পাওয়া যায়। অনেক দূর থেকে বাতাসে তার গন্ধ ভাসে। কোনো বাড়িতে এক টুকরো আসল কস্তুরী রাখলে দশ বছর পরেও তার গন্ধ পাওয়া যায়।'

ঈশানবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তুমি দেখেছ তাদের? আমরা তো এখানে তিনদিন থাকব। তাদের দেখা মিলবে?'

বশির দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। এখানেই একবার দেখেছি। অনেকটা ছাগলের আকৃতির হয়। পাগুলো সরু সরু। ওই পা নিয়ে খাড়া পাহাড়ের ঢালে চলতে পারে ওরা। কুড়ি-পঁচিশ ফুট লাফাতে পারে অনায়াসে। পুরুষ কস্তুরী হরিণ চেনা যায় তাদের ওপরের চোয়ালের বাইরে নেমে আসা দাঁত থেকে। অমন দাঁত অন্য কোনো হরিণের থাকে না। তবে দেখা মিলবে কিনা বলা যায় না। নসিবে থাকলে মিলবে। ওরা খুব লাজুক প্রাণী। নারী-পুরুষ বছরের অধিকাংশ সময় একা একাই ঘোরে মিলনের ঋতু ছাড়া।'

এ কথা বলে একটু থেমে বশির আঙুল তুলে সামনের ঢালের জঙ্গলের মাথাটা দেখিয়ে বলল, 'ওই যে ওখানে কখনও-সখনও ওদের দেখা যায়। আমরা একবার কাঠ কাটতে গিয়ে ওখানে একটা কস্তুরী হরিণ দেখেছিলাম।' বশিরের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকিয়ে ঈশানবাবু আবারও জানতে চাইলেন, 'ওখানে কোনো ঘর-বাড়ি আছে নাকি?'

বশির জবাব দিল, 'ওখানে একটা পুরোনো ছোট মন্দির ছিল একসময়। এক সন্ন্যাসী থাকতেন। তবে এখন আর নেই। মন্দিরটাও ভেঙে গেছে। কাঠামোর একটা অংশ শুধু এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই দেখা যাচ্ছে। কোনো লোক থাকে না ওখানে। গিয়ে দেখে আসতে পারেন জায়গাটা। হয়তো বা কস্তুরীরও দেখা মিলতে পারে।'—কথা শেষ করে হাসল বশির। এ জায়গা সম্বন্ধে ঈশানবাবুর মোটামুটি কিছুটা জানা হয়ে গেল বশিরের কাছ থেকে। তিনি বশিরকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। কোনো প্রয়োজন হলে বলব তোমাকে।'

সেলাম ঠুকে বশির এগোল তার সঙ্গীদের দিকে।

২

ঈশানবাবু বেশ কিছুক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বশির আর তার সঙ্গীরা তাঁবুর সামনে বসে আড্ডায় মেতেছে। মাথার ওপর মধ্যাহ্নের সূর্যের ঝলমলে আলো। তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ার ইচ্ছা নেই ঈশানবাবুর। আবার বশিরদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসাটাও তাঁর পক্ষে সমীচীন নয়, তাই ঈশানবাবু ভাবলেন আশপাশটা একটু দেখে আসা যাক।—এ কথা ভেবে নিয়ে তিনি সোজা এগোলেন সামনের ঢালটার দিকে। যার মাথার ওপর রয়েছে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বশিরের কথা অনুযায়ী যেখানে কস্তুরী মৃগর দেখা মিলতে পারে।

ঢালটা ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠেছে। সেটা বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন ঈশানবাবু। শীতকালে এই ঢালের মাটি নিশ্চয়ই বরফের চাদরের তলায় ঢাকা থাকে, এখন পাতার রাশিতে ঢাকা, আর তার ফাঁক দিয়ে কোথাও কোথাও ঘাসও উঁকি দিচ্ছে। ঈশানবাবুর যাত্রাপথের হাত পনেরো-কুড়ি তফাতে তফাতেই আছে বিরাট বিরাট পাইন গাছ। কিছু ওক গাছও আছে। জল চুঁইয়ে পড়ছে তার গুঁড়ি বেয়ে। ঝিঁঝিপোকার শব্দ আর গাছের মাথা থেকে জল খসে পড়ার টুপটাপ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ঈশানবাবু একসময় ঢালের মাথার ওপর উঠে এলেন। জায়গাটাতে পৌঁছে বেশ একটু অবাকই হলেন তিনি। প্রায় একটা ফুটবল মাঠের মতো সমতল জায়গা। নীচ থেকে যা ঠিক বোঝা যায় না। যেখানে মন্দিরের ভগ্নাবশেষটা দাঁড়িয়ে আছে, সে জায়গার পাইনবন একটু ফাঁকা ফাঁকা হলেও কিছুটা এগিয়ে তা গিয়ে মিশেছে ঘন বনের সঙ্গে। আধো অন্ধকার আর ঘন কুয়াশামাখা বন সম্ভবত গিয়ে মিশেছে পাশের পাহাড়ের ঢালের সঙ্গে।

চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে ঈশানবাবু এগোলেন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের দিকে। উচ্চতায় বা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে মন্দিরটা কত বড় ছিল, তা আজ তার ধারণা করার কোনো উপায় নেই। তবে কাঠ আর পাথুরে দেওয়াল আজও দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপরে। ঢালের প্রায় কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা এই দেওয়ালটাকেই নীচ থেকে ঈশানবাবু দেখতে পেয়েছিলেন। মন্দিরটা কোন দেবদেবীর তাও আজ আর বোঝার কোনো উপায় নেই। কিছুক্ষণ সেই ধ্বংস্তূপের মধ্যে ঘোরাঘুরির পর ঈশানবাবু ফেরার পথ ধরতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ তাঁর নাকে এল, আর তারপরেই একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, একলা দাঁড়িয়ে থাকা সেই দেওয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক। তার পরনে চেককাটা কোট, পায়ে জুতো, মাথায় টুপি। লোকটা হিন্দিতে ঈশানবাবুকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ট্যুরিস্ট?'

ঈশানবাবু জবাব দিলেন, 'না, ট্যুরিস্ট নই। একটা সরকারি কাজে এখানে এসেছি। ওই নীচেই তাঁবু ফেলেছি।'

লোকটা এবার ঈশানবাবুর কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। সেই মিষ্টি গন্ধটা আর-একটু বাড়ল। লোক না বলে ছেলে বলাই মনে হয় ভালো। তার দাড়ি-গোঁফ কামানো ফর্সা মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে ঈশানবাবুর মনে হল এই আগন্তুকের বয়স খুব বেশি হলে সাতাশ-আঠাশ হবে। ছেলেটা এরপর ঈশানবাবুকে অবাক করে দিয়ে স্পষ্ট বাংলায় প্রশ্ন করল, 'বাঙালি মনে হচ্ছে? কলকাতা থেকে আসছেন?'

মৃদু বিস্মিতভাবে ঈশানবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে আসছি। আপনিও বাঙালি নাকি? ট্যুরিস্ট?'

ছেলেটা হেসে বলল, 'না বাঙালি নই। আমার নাম রঘুবীর ত্রিবেদী। আদতে উত্তরপ্রদেশের মানুষ হলেও বহু বছর কলকাতায় কাটিয়েছি। আপনার হিন্দি বলার ঢং দেখে বুঝতে পারলাম আপনি বাঙালি। না, আমি ট্যুরিস্ট নই, এখানেই থাকি।'

ঈশানবাবু এবার নিজের পুরো পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনি কী করেন? চাকরি না ব্যবসা?'

ত্রিবেদী হেসে বলল, 'কলকাতায় থাকাকালীন বড়বাজারে ব্যবসা করতাম। এখানে এখন আপাতত কিছু করি না।'

ব্যক্তিগত ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করা সমীচীন নয় মনে করে এসব ব্যাপারে তাকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না ঈশানবাবু। তবে যেহেতু ছেলেটা এখানেই থাকে তাই জায়গাটা সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার জন্য ঈশানবাবু বললেন, 'আচ্ছা, শুনলাম, এই পাইন বনে নাকি কস্তুরী হরিণ থাকে? কথাটা কি সত্যি?'

ত্রিবেদী, প্রশ্ন শুনে বেশ কয়েকমুহূর্ত ঈশানবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ওই যে পাশের পাহাড়ের ঢালে ওরা থাকে। ওদিক থেকেই ওরা এখানে আসে।'

ঈশানবাবু বললেন, 'আপনি দেখেছেন ওদের?'

ত্রিবেদী হেসে বলল, 'বহুবার। আমি তো এখানেই থাকি। বিশেষত এই সময়টা ওদের প্রজনন ঋতু। ওরা এখানে আসে। পুরুষ হরিণের কস্তুরীর গন্ধ স্ত্রী হরিণদের কাছে টেনে আনে। মজার ব্যাপার হল, পুরুষ হরিণ কিন্তু বুঝতে পারে না যে কস্তুরীর ঘ্রাণ তার শরীর থেকে আসছে। সেই গন্ধের খোঁজে নিজেরাও এসময় উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করে।'

তার কথা শুনে ঈশানবাবু বললেন, 'আমি একবার গুজরাটে কাজ করতে গিয়ে সিংহ দেখেছিলাম। এখানে এসে যদি কস্তুরী মৃগ দেখতে পাই তাহলে সেটা জীবনে স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। ছোটবেলা থেকে কস্তুরী মৃগর কথা শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি।'

ত্রিবেদী, ঈশানবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি সত্যি কস্তুরী হরিণ দেখতে চান?'

ঈশানবাবু বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। কেন, আপনি দেখাতে পারবেন?'

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে ত্রিবেদী জবাব দিল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি রাতে এখানে আসতে পারবেন?'

'রাত' কথাটা শুনে ঈশানবাবু একটু দমে গিয়ে বললেন, 'রাতে! কেন দিনের বেলা ওদের দেখা মিলবে না?'

ত্রিবেদী বলল, 'না, এমনিতেই ওরা খুব লাজুক প্রাণী। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ওরা একা একাই ঘোরে। আজ বসন্তপূর্ণিমার রাত। এ রাতে ওদের দেখা মেলে। মিলনের জন্য পাগল হয়ে ওঠে ওরা।'

কথাটা শুনে ঈশানবাবু ইতস্তত করে বললেন, 'আসলে অচেনা জায়গা তো, তাই রাতে আসতে কেমন কেমন যেন লাগছে।'

তার কথার উত্তরে ত্রিবেদী বলল, 'আপনার তাঁবু তো কাছেই। এখান থেকে হাঁক দিলে আপনার তাঁবুতে শব্দ পৌঁছবে। এখানে কোনো চোর-ডাকাত নেই। অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী নেই। আর আমি তো এখানে থাকবই। অবশ্য আমাকে যদি আপনার ভদ্রলোক মনে না হয় তবে অন্য কথা।'

ত্রিবেদীর শেষ কথাটা শুনে ঈশানবাবু লজ্জিত ভাবে বললেন, 'না, না, আপনাকে আমার যথেষ্ট ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। আর আপনি যখন নিশ্চিতভাবে বলছেন যে ওদের দেখা মিলবে, তখন আসার চেষ্টা করব।'

ত্রিবেদী বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই দেখাব আপনাকে। তবে একলা আসবেন। কারণ এমনিতেই ওরা লাজুক প্রাণী। আমি দীর্ঘদিন এখানে আছি বলে ওরা আমাকে চেনে। বেশি লোকের উপস্থিতি ওরা ধরে ফেলবে। তখন আর দেখা দেবে না।' কথাটা শুনে ঈশানবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, এলে একলাই আসব। এবার তাঁবুতে ফিরব। আপনি নীচে যাবেন না?' ত্রিবেদী জবাব দিল, 'না, আমি নীচে যাব না। আমি তো এখানেই থাকি। সত্যি কথা বলতে কী, এই কস্তুরী মৃগর জন্যই বহু বছর ধরে এখানে রয়েছি আমি।'

ঈশানবাবু বললেন, 'তার মানে? আপনি কি ওদের নিয়ে কোনো গবেষণা বা প্রিজারভেশনের কাজ করছেন?'

এ প্রশ্নের জবাবে ত্রিবেদী হেসে বলল, 'রাতে আসুন না। এখানে কেন আছি সে গল্প তখনই না-হয় শুনবেন। আর হরিণও দেখবেন।'

ত্রিবেদীর কথা শুনে হেসে 'আচ্ছা তাই হবে' বলে পাহাড়ের মাথার সমতল জায়গাটা অতিক্রম করে ঢাল বেয়ে নীচে নেমে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

৩

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল। তারপর সূর্য ডুবতে শুরু করল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কেউ যেন লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে পাহাড়শৃঙ্গগুলোর মাথায়! সে দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন ঈশানবাবু। তারপর সত্যিই একসময় সূর্য ডুবে গেল। ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল পাহাড়ের মাথা থেকে। ঈশানবাবু তাঁবুর ভিতর ঢুকে ব্যাটারি লাইট জ্বেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে স্থানীয় ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত একটা বই খুলে বসলেন। কিন্তু বইটাতে যেন ঠিক মনোনিবেশ করতে পারছেন না তিনি। তাঁর বারেবারে মনে পড়ে যাচ্ছে ত্রিবেদী নামের সেই ছেলেটার কথা। আর মাঝে মাঝে তাঁর নাকেও যেন

একটা মিষ্টি গন্ধ এসে লাগছে! যে গন্ধটা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার সময় পেয়েছিলেন। যদিও তিনি এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি যাবার ব্যাপারে।

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ বশির ঘরে ঢুকল খাবার নিয়ে। খাবারের থালাটা নামিয়ে রেখে তাঁবুর বাইরে বেরোতে গিয়েও সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নাক টেনে বলল, 'সাব কি কস্তুরী মেখেছেন নাকি?'

ঈশানবাবু মৃদু অবাক হয়ে বললেন, 'কই না তো?'

বশির আবারও নাক টেনে বলল, 'জরুর কস্তুরীর গন্ধ আছে। এ গন্ধ আমি চিনি। আপনি ওই পাহাড়ের ওপরে গেছিলেন তাই তো?'

ঈশানবাবুর এবার খেয়াল হল ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা হবার সময় বেশ কয়েকবার একটা মিষ্টি গন্ধ তাঁর নাকে এসে লেগেছিল। তবে কি সে কস্তুরী মেখেছিল? আর তার থেকেই গন্ধটা ঈশানবাবুর গায়ে এসেছে? যেটা তিনি নিজেও মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিলেন? এ ভাবে কি গন্ধ ছড়ানো সম্ভব?'

ঈশানবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ওপরে গেছিলাম। ওখানেও একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগছিল বটে!'

বশির বলল, 'আপনাকে বলেছিলাম না ওখানে কস্তুরী হরিণ আছে। নিশ্চয়ই আপনি এমন কোনো জায়গাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অথবা এমন কোনো জায়গাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অথবা এমন কোনো জায়গাতে হাত রেখেছিলেন যেখানে কস্তুরী হরিণ এসে দাঁড়িয়েছিল বা গা ঘষেছিল। তার থেকেই গন্ধটা আপনার গায়ে এসেছে।'

ঈশানবাবু বললেন, 'কস্তুরীর এত ক্ষমতা!'

বৃদ্ধ বশির দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'জি বাবুসাব। তিন হাজার কিসিমের মধ্যে আপনি যদি এক টুকরো আসল কস্তুরী রাখেন তবে ওই তিন হাজার কিসিমের জিনিসে কস্তুরীর গন্ধ লাগে! আমাদের এখানে একটা কথা চালু আছে, কেউ যদি একবারের জন্য গায়ে খাঁটি কস্তুরী লাগায় তবে সে মরে জন্নত বা স্বর্গে গেলে হুরি অর্থাৎ পরির দল তাকে ঘিরে ধরে। আত্মার গায়েও কস্তুরীর গন্ধ লেগে থাকে।'

তার কথা শুনে ঈশানবাবুর মনে পড়ল, তিনি কোথায় যেন শুনেছিলেন যে কস্তুরী শুধু যৌন বলবর্ধকই নয়, তার গন্ধ তীব্র কামোদ্দীপকও বটে। যে কারণে সম্রাটদের হারেমে কস্তুরীর প্রচুর চাহিদা ছিল। মোহনলাল এই কাশ্মীরেরই মানুষ ছিলেন। তিনি নাকি নবাব সিরাজদৌল্লার কাছে প্রথমে গেছিলেন এই কস্তুরী বিক্রির জন্যই। তারপর দুজনের সখ্য হয়।

বশির এরপর বলল, 'আপনার কোনো কাজ না থাকলে এবার আমরা খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ব।'

ঈশানবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, শুয়ে পড়ো। কাল আলো ফুটলেই কাজ শুরু করব।'

বশির সেলাম দিয়ে চলে যাবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া শুরু করলেন ঈশানবাবু। খেতে খেতে তিনি ভাবতে লাগলেন ওই ছেলেটার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি কস্তুরী মৃগ দেখতে যাবেন, নাকি যাবেন না? কিন্তু তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। খাওয়া সেরে জলের বোতল নিয়ে হাত ধোবার জন্য বাইরে বেরোলেন ঈশানবাবু। বশির আর তার লোকজনেরা ততক্ষণে তাদের তাঁবুতে ঢুকে পর্দা ফেলে শুয়ে পড়েছে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। এখানকার আকাশ দূষণমুক্ত বলেই হয়তো চাঁদটাকে অনেক বেশি বড় আর উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। জ্যোৎস্না যেন আকাশ থেকে গলে গলে পড়ছে এই নির্জন কিরীটশোভিত পৃথিবীর বুকে। ঈশানবাবুর চোখ গেল সামনের ঢালের মাথার ওপর সেই পাইন বনের দিকে। তার মাথার ওপর আলো ছড়াচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের মধ্যেও আদিমতা থাকে, যৌনতার আহ্বান থাকে, আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই হয়তো চাঁদনি রাতে মিলিত হয় কস্তুরী হরিণ-হরিণীর দল, কস্তুরীর গন্ধে মেতে উঠে মিলিত হয় বন্য যৌনতায়।—এ কথাটা ঢালের মাথার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন ঈশানবাবু।

আরও কিছুক্ষণ চন্দ্রাতাপের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বনানীর দিকে তাকিয়ে ঈশানবাবুর মনে হল, ওখানে যেতে তাঁর সমস্যা কোথায়? প্রথমত, ওই ছেলেটাকে তাঁর খারাপ লোক বা মিথ্যাবাদী বলে মনে হয়নি। কস্তুরী মৃগ দেখার সুযোগ হয়তো জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে না। আর দ্বিতীয়ত তার মনে যদি অন্য কোনো মতলব থেকেও থাকে তবে সে সহজে ঈশানবাবুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। পঞ্চাশ বছর বয়স হলেও ঈশানবাবু এখনও নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। তাঁর শরীর যথেষ্ট শক্তপোক্ত আর সক্ষম। কিছুদিন আগে এক ডেঁপো ছোকরাকে এক চড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সব থেকে বড় কথা রিভলবারটা তো সঙ্গে রইলই।—এ কথাগুলো ভেবে নিয়ে ঈশানবাবু কয়েকমুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি যাবেন। মুখ ধুয়ে তাঁবুতে ঢুকে প্রথমে পোশাক পাল্টে জুতো পরলেন। সুটকেস থেকে রিভলবার বার করে সেটা একবার পরীক্ষা করে কোমরে গুঁজে নিয়ে গায়ে চামড়ার জ্যাকেট চাপিয়ে টুপি-মাফলার-দস্তানায় সজ্জিত হয়ে এরপর আবার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে সামনের পাহাড়ের ঢালের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

৪

রাত হলেও ঢাল বেয়ে উঠতে খুব একটা কষ্ট হল না ঈশানবাবুর। তিনি ওপরে উঠে এলেন। সমতল জায়গাটাতে প্রাচীন মন্দিরের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাঠামোর ওপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তবে এখানে-ওখানে কিছুটা তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছগুলোকে কেমন যেন জীবন্ত মানুষের মতো মনে হচ্ছে। তারা যেন নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ঈশানবাবুর দিকে। মনের ভিতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি হল ঈশানবাবুর। কিন্তু এরপরই ত্রিবেদীকে দেখতে পেয়ে তাঁর অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেল। একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছেলেটা এসে দাঁড়াল ঈশানবাবুর সামনে। ছেলেটার কোটের বুকের বোতাম খোলা। চাঁদের আলোতে মুহূর্তের জন্য একটা জিনিস ঝিলিক দিয়ে উঠল তার বুকের কাছে। ত্রিবেদীর গলাতে একটা সোনার লকেটসমেত হার আছে। আর সে কাছে এসে দাঁড়াতেই আবারও সেই মিষ্টি গন্ধ এসে লাগল ঈশানবাবুর নাকে। ত্রিবেদী মৃদু হেসে ঈশানবাবুকে বলল, 'আপনি যে আসবেন সেটা আমি অনুমান করেছিলাম।'

ঈশানবাবু হেসে বললেন, 'সুযোগটা হাতছাড়া করতে মন চাইল না, চলেই এলাম। হরিণ দেখা যাবে তো?'

ত্রিবেদী হেসে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। হরিণী তো নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন। এখানেই তারা আসবে।'

ঈশানবাবু এরপর বললেন, 'আচ্ছা, একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি, তখনও পেয়েছিলাম। এটা কি কস্তুরীর গন্ধ? আপনার গা থেকে আসছে?'

ত্রিবেদী জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

এরপর কিছুটা তফাতে মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ি দেখিয়ে বলল, 'চলুন ওখানে গিয়ে বসি।' ত্রিবেদীর কথামতো ঈশানবাবু তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে গুঁড়িটার ওপর বসলেন, ত্রিবেদীও তাঁর পাশে বসল। তাদের সামনে একটু দূরে একটা কচ্ছপের পিঠের মতো উন্মুক্ত জায়গা, তারপর ছোট ছোট পাইন গাছের সারি গিয়ে মিশেছে বড় বড় গাছের দঙ্গলের সঙ্গে। সেদিকে বনের গভীরে চাঁদের আলো প্রবেশ না করলেও ঈশানবাবুদের সামনে কচ্ছপের পিঠের মতো উন্মুক্ত জায়গাটা চাঁদের আলোতে ফটফট করছে। সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাছের পাইন গাছের পাতাগুলো রুপোর পাতের মতো চিকচিক করছে চাঁদের আলোতে। বাতাসে কস্তুরীর মৃদু মিষ্টি গন্ধ। সব মিলিয়ে পরিবেশটা বেশ ভালো লাগল ঈশানবাবুর। তিনি বললেন, 'চারপাশটা খুব সুন্দর লাগছে!'

ত্রিবেদী বলল, 'এখানে একটা খুব পুরোনো শিবমন্দির ছিল। মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গাটা ওই টিপি ছাড়িয়ে আরও কিছুটা বিস্তৃত ছিল। খেয়াল করে দেখুন টিপির ওপাশের গায়ের গাছগুলো বয়সে অনেক নবীন।'

ঈশানবাবু জানতে চাইলেন, 'মন্দিরটা ধ্বংস হল কীভাবে?'

ত্রিবেদী জবাব দিল, 'আমি এখানে আছি অন্তত দশ বছর। তার বেশি সময়ও হতে পারে কিন্তু কম হবে না। আমি আপনাকে আমার গল্পটা বলি। তাহলে সব বুঝতে পারবেন।'

ঈশানবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন আপনার গল্প।'

একটু চুপ করে রঘুবীর ত্রিবেদী বলতে শুরু করল তার কথাঃ।

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমি জন্মসূত্রে উত্তরপ্রদেশের মানুষ। কলকাতার বড়বাজারে আমার ব্যবসা ছিল। আমার কোনো ভাইবোন ছিল না। আমি তখন সদ্য যুবক। বাবা-মা মারা যাবার পর দেশের সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। বড়বাজারে কাপড়ের ব্যবসা। ভালোই চলছিল ব্যবসা। বছর সাত-আটের মধ্যে বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল কারবার। বিয়ে করিনি, একলা মানুষ। দিব্যি ছিলাম ব্যবসা নিয়ে। বেশ কিছু নগদ টাকাও জমিয়ে ফেলেছিলাম এ সুযোগে।

বড়বাজারে নানা ধরনের লোক আসে। একদিন একজন লোক এসে আমাকে জানাল, শেয়ার বাজারে টাকা লাগালে নাকি অনেকগুণ বেশি লাভ হতে পারে ছিট কাপড়ের ব্যবসা থেকে। তার কথা শুনে একটু ইতস্তত করেই আমার জমানো টাকার একটা অংশ শেয়ার বাজারে লাগালাম। তিন মাসের মধ্যে সে টাকা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল আমার কাছে। আর এরপরই আমি ঢুকে গেলাম শেয়ার বাজারের কারবারে। আমার সব টাকা ঢালতে শুরু করলাম এ ব্যবসাতে। সত্যি কথা বলতে কী ক্ষতি যে কখনও হতো না তা নয়, তবে লাভ যা হতো তা ক্ষতির থেকে অনেক বেশি। ছিট কাপড়ের

ব্যবসা গুটিয়ে আমি এরপর পুরোপুরি ঢুকে পড়লাম শেয়ার ব্যবসাতে। কিন্তু কারো দিন সমান যায় না। হঠাৎই একদিন বজ্রপাতের মতো শেয়ার বাজারে ধস নামল, আমি যে কোম্পানির শেয়ার কিনেছিলাম তাতে। আমার প্রায় সব টাকা আমি লগ্নি করেছিলাম সে কোম্পানিতে।

আমি প্রাথমিক অবস্থায় ভেঙে না পড়ে বাজার থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করে অন্য একটা কোম্পানির শেয়ার কিনলাম লাভের আশাতে। আর সেটাই আমার সব থেকে বড় ভুল ছিল। খারাপ সময় মানুষকে যখন তাড়া করে তখন সে কিছুতেই তার পিছু ছাড়তে চায় না। আমি নতুন কোম্পানির শেয়ারে টাকা ঢালবার কিছুদিনের মধ্যে সে কোম্পানিও ডুবে গেল, আর আমি পড়ে গেলাম অথৈ জলে।'—এই বলে থেমে গেল ত্রিবেদী। সে তাকিয়ে রইল সামনের ঢিপিটার দিকে।

তাকে চুপ হয়ে যেতে দেখে ঈশানবাবু জানতে চাইলেন, 'কিন্তু সে ঘটনার সঙ্গে এ জায়গার সম্পর্ক কী?'

ত্রিবেদী জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সে কথা এবার বলছি।'

আবার সে বলতে শুরু করল তার কাহিনি, 'আমার দুর্দশা এরপর ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। পাওনাদাররা এসে টাকা ফেরতের জন্য বাড়িতে হানা দিতে শুরু করল। প্রথমে গালিগালাজ তারপর কেউ কেউ মারধরের হুমকিও দিতে শুরু করল। আমার তখন সম্বল বলতে দু-হাজার টাকা আর আমার গলার এই সোনার লকেটটা। আর বাজারে আমার দেনার পরিমাণ প্রায় লাখ তিনেক টাকা! পাওনাদারের হুমকিতে একসময় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কলকাতা থেকে দূরে কোথাও আমাকে পালাতে হবে। অন্তত ততদিন আমাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে যতদিন না শেয়ার বাজার আবার চাঙ্গা হয়। আমি আমার লগ্নি করা টাকা ফেরত পেয়ে পাওনাদারদের ধার শোধ করতে পারি। তবে এত দুরে যে আমি চলে আসব তা ভাবিনি...।'

ঈশানবাবু তার কথার মাঝেই বলে উঠলে, 'তবে এলেন কীভাবে?'

ত্রিবেদী বলল, 'ভাগ্যই হয়তো আমাকে অদ্ভুতভাবে টেনে এনেছিল এখানে। কলকাতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় আমি সামান্য কিছু জামাকাপড় নিয়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হলাম। আমার ইচ্ছা ছিল বাংলারই কোনো মফস্বল শহরে গিয়ে কিছু কাজ খুঁজে নিয়ে সেখানে থাকার।

আমি যখন টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছি ঠিক তখনই আমি দেখতে পেলাম আমার এক বড় পাওনাদারকে। সঙ্গে কয়েকজন গুন্ডা চেহারার লোক। পাওনাদার আর তার সঙ্গীদের চারপাশে তাকানোর ভঙ্গি দেখে আমি বুঝতে পারলাম তারা আমাকেই খুঁজছে! কোনোভাবে আমার পালানোর খবর জানতে পেরে তারা পিছু ধাওয়া করে এসেছে! এবার কী করব আমি! ধরা পড়লে চরম লাঞ্ছনা কপালে। ঠিক সেই সময় আমি শুনতে পেলাম একটা ট্রেনের হুইসেলের শব্দ। কোনো একটা ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে। বাঁচার জন্য ভিড় ঠেলে আমি ছুটতে শুরু করলাম সেই ট্রেন লক্ষ করে। তারপর লাফিয়ে উঠে পড়লাম সেই অজানা ট্রেনে।

আমার কাছে কোনো টিকিট ছিল না। ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। টিকিট চেকারের মুখে পড়ার ভয়ে আমি একটা আপার বাংকে উঠে তাড়াতাড়ি একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমের ভান

করে শুয়ে পড়লাম। ছুটে চলল ট্রেন। সৌভাগ্যক্রমে কেউ আর আমার কাছে টিকিট চাইতে এল না। পরদিন ভোরবেলা আমি সহযাত্রীদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম এ ট্রেন জম্মু যাচ্ছে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ট্রেন যেখানে যাচ্ছে আমি সেখানেই নামব। একদিন পর আমি উপস্থিত হলাম জম্মুতে। সেখানে ক'দিন থাকার পর চলে এলাম শ্রীনগর। তারপর ঘুরতে ঘুরতে পহেলগাঁওতে।'—একটানা কথাগুলো বলে থামল ত্রিবেদী।

ঈশানবাবু বললেন, 'আপনার কাশ্মীরে আসার ঘটনাটা বেশ রোমাঞ্চকর তো!'

ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট একটা হাসি ফুটিয়ে ত্রিবেদী বলল, 'হ্যাঁ, তবে আসল গল্প এবার বলব। এতক্ষণ যা বললাম তা বলতে পারেন আমার কাহিনির ভূমিকা মাত্র।'

ঈশানবাবু উৎসাহিতভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন।'

মাথার ওপরের চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে সামনের জমিটাতে। পাইন গাছের গায়েও পিছলে পড়ছে আলো। বাতাসে কস্তুরীর মিষ্টি গন্ধ যেন মৃদু বেড়েছে। শুধু ত্রিবেদীর গায়ের গন্ধ নয়, ঈশানবাবুর মনে হল, হয়তো বা কোনো কস্তুরী মৃগও কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারে! ত্রিবেদী এবার শুরু করল তার আসল গল্প—

৫

'পহেলগাঁওতে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন আমার পকেট আরও ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি আশ্রয় নিলাম অতি সস্তার একটা বাড়িতে। ঘোড়ার সহিসরা যেখানে রাত কাটায়। সেখানে ক'দিন কাটাবার পর আমি বুঝতে পারলাম আমার পকেটের যা হাল তাতে দৈনিক খবার খরচ নিয়ে মাত্র কুড়ি টাকা ভাড়াতেও বেশিদিন থাকা সম্ভব হবে না। হঠাৎই এক ঘোড়াঅলার মুখে খবর পেলাম এখানে নাকি এক মন্দির আছে। এক সাধুবাবা থাকেন এই মন্দিরে। ভালো লোক। কেউ মন্দিরে গেলে যত্নআত্তি করেন। মন্দিরের নাম 'সৌগন্ধ মন্দির' অর্থাৎ 'সুগন্ধ মন্দির'। যদিও তখনও আমি জানতাম না, এ মন্দিরের কেন এমন নাম। আমি মন্দিরের কথা শুনে ভাবলাম, একবার মন্দিরটাতে গিয়ে দেখা যাক। যদি সেখানে আশ্রয় মিলে যায়, বিনা খরচায় ক'দিন থাকা-খাবার বন্দোবস্ত হয়? এ কথা ভেবে পহেলগাঁও থেকে আমি চলে এলাম এখানে।

আমি যখন ঢাল বেয়ে এই চত্বরটাতে উঠে এলাম তখন বিকাল। বসন্তকালের শুরু হলেও সেবার শীতকালে প্রচণ্ড তুষারপাত হওয়াতে মন্দির সংলগ্ন এই চত্বরটা তুষারের চাদরের আড়ালে মোড়া ছিল। এ জায়গাতে উঠে আসতেই আমার নাকে একটা মিষ্টি গন্ধ এসে লাগল। সে গন্ধ তখনও আমার চেনা ছিল না। কাঠ আর পাথরের তৈরি এক অতি প্রাচীন মন্দির। বয়সের ভারে বৃদ্ধ মানুষের মতো কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। আমি সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। এই শীতের দেশেও তাঁর গায়ে একটা নামমাত্র বস্ত্রখণ্ড। খালি পা। আমি বুঝতে পারলাম ইনিই এই মন্দিরের সন্ন্যাসী, আমি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললাম, আমি

দেশভ্রমণে বেরিয়ে এখানে এসেছি। টাকা-পয়সা সব শেষ। তিনি যদি আমাকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দেন তবে আমি বাঁচতে পারি।

আমার কাতর আবেদন শুনে সাধুবাবা বললেন, 'দেবতার মন্দিরে কেউ আশ্রয় চাইলে তাকে তো আর ফেরানো যায় না। এসো ভিতরে এসো।'

আমি প্রবেশ করলাম মন্দিরে। গর্ভগৃহে একটা শিবলিঙ্গ আছে। সাধুবাবা প্রথমে আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। দেবতা দর্শনের পর আমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'সন্ন্যাসীরা পূর্বাশ্রমের পরিচয় দেয় না। তবু তোমাকে কয়েকটা কথা বলি। প্রথম জীবনে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম আমি। একদিন বৈরাগ্য দেখা দিল। দেশের নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এ মন্দিরে পৌঁছলাম আমি। তখন এই প্রাচীন মন্দিরে এক সন্ন্যাসী থাকতেন। আমিও সন্ন্যাস গ্রহণ করে এ মন্দিরেই রয়ে গেলাম। একসময় সেই সন্ন্যাসী দেহ রাখলেন। তারপর থেকে আমি এখানে একলাই থাকি। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর এখানে আছি।'

এরপর সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আরও কিছু কথা বলার পর আমি বুঝতে পারলাম কৌপীন পরা এই সন্ন্যাসী প্রকৃত অর্থেই নানা জ্ঞানের অধিকারী। যাই হোক, সেই সন্ন্যাসী আমার খাবারের ব্যবস্থা করলেন, একটা ঘরে খড়ের বিছানাতে আমার রাত্রিবাসেরও ব্যবস্থা করলেন। একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম যে মন্দিরের ঘরে-বাইরে সেই মিষ্টি গন্ধ যেন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ঘুমের মধ্যেও যেন আমি সে গন্ধ টের পেতে থাকলাম!

পরদিন ভোর হল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সাধুবাবার সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে গন্ধের ব্যাপারটা জিগ্যেস করলাম।

তিনি হেসে বললেন, 'চলো তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। বাইরে চলো।'

তাঁর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। আপনার সামনে যে উঁচুমতো জায়গাটা দেখছেন ঠিক ওখানেই কাঠের বেড়া দেওয়া বেশ বড় একটা খোঁয়াড়ের মতো মাথায় পাতার ছাদ দেওয়া ঘর ছিল। সাধুবাবা আমাকে নিয়ে ওই ঘরটার দিকে এগোতেই মিষ্টি গন্ধের তীব্রতা যেন আরও বাড়তে লাগল। খোঁয়াড়টার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম এই মিষ্টি গন্ধের উৎসস্থল এই ঘরটাই। সাধুবাবার সঙ্গে ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিতেই আমি দেখতে পেলাম একটা প্রাণীকে। ছাগলের মতো একটা ছোট প্রাণী উত্তেজিতভাবে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পায়চারি করছে। তার শিং দুটো ছোটো ছোটো। কিন্তু চোয়ালের ওপর থেকে ইঞ্চি চারেক লম্বা ছুরির ফলার মতো দুটো দাঁত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর তীব্র মিষ্টি গন্ধটা তার গা থেকেই আসছে!

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'সাধুবাবা এটা কী প্রাণী?'

তিনি বললেন, 'কস্তুরী মৃগর নাম শুনেছ? এটা কস্তুরী মৃগ। ওর পেটের কাছটা খেয়াল করো। নাভির কাছে।'

তাঁর কথা শুনে আমি প্রাণীটাকে ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম। একটা আবের মতো অংশ আছে সেখানে। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি ওকে কোথায় পেলেন?'

সাধুবাবা বললেন, 'বছর বারো আগে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম এখানকারই এক জঙ্গল থেকে। এখানকার জঙ্গলে কস্তুরী মৃগ আছে। কোনো কারণে ওর মা ওকে ত্যাগ করেছিল। আমি ওকে তুলে এনেছিলাম মন্দিরে। তারপর থেকে এখানেই আছে। ওর গায়ের গন্ধের জন্যই আজকাল এ মন্দিরকে অনেকে সৌগন্ধ মন্দির নামে ডাকে।'

এ কথা বলার পর তিনি বললেন, 'এমনি সময় ও ছাড়াই থাকে। কিন্তু এই বসন্তকালে ওদের প্রজনন ঋতুতে ওকে আটকে রাখতে হয়। নইলে কামের তাড়নায় হরিণীর খোঁজে ও জঙ্গলে পালাবে। কিন্তু সমস্যা হল ও নিজে কোনোদিন খাবার খুঁজে খায়নি। আমি ওকে ওর নিজের হাতে শিশু অবস্থা থেকে খাইয়ে এসেছি। জঙ্গলে গেলে নির্ঘাত ও না খেয়ে অথবা অন্য কোনো পুরুষ হরিণের সঙ্গে লড়াইতে মারা পড়বে। তাই ওকে এখন আটকে রাখতে বাধ্য হচ্ছি।'

সন্ন্যাসীর কথা শুনে আবারও আমি ভালো করে তাকালাম হরিণটার দিকে। সাধুবাবার কথা যে সত্যি তা এবার আমি বুঝতে পারলাম। কস্তুরী মৃগটার টুকটুকে লাল শিশ্নটা বেশ কিছুটা তার আবরণের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কামের আগুনে জ্বলছে প্রাণীটা!

তাকে দেখাবার পর সাধুবাবা আমাকে নিয়ে আবার মন্দিরে যাবার জন্য এগোলেন। বরফমোড়া চত্বর দিয়ে এগোতে এগোতে আমি কৌতূহলবশত প্রশ্ন করলাম, 'একটা হরিণের দেহে কী পরিমাণ কস্তুরী থাকে?'

তিনি বললেন, 'দশ বছর বয়সে কস্তুরী গ্রন্থি পরিপক্ক হয়। অন্তত পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি গ্রাম কস্তুরী থাকে একটা হরিণের গ্রন্থিতে।'

আমি বললাম, 'শুনেছি কস্তুরীর অনেক দাম। আসল কস্তুরী রাজারাজড়াদের জিনিস!'

সন্ন্যাসী বললেন, 'এক ভরি আসল কস্তুরী তিন ভরি সোনার দামের সমান। সোনার দর অনুসারে কস্তুরীর বাজার দর ঠিক হয়।'

সাধুবাবার সঙ্গে আমি এরপর মন্দিরে প্রবেশ করলাম।'

এ পর্যন্ত বলে ত্রিবেদী থামল। বাতাসে কস্তুরীর গন্ধটা যেন আরও বেড়েছে বলে মনে হল ঈশানবাবুর। ত্রিবেদী যেন ঘাড়টা একটু উঁচু করে টিপির ওপাশের পাইন বনের আড়ালটা দেখার চেষ্টা করল। চাঁদের আলোতে তার চোখে-মুখে মৃদু উত্তেজনার ছাপ। তবে কি হরিণ কাছেই আছে? তবে সেদিকে ঈশানবাবু তেমন কিছু দেখতে পেলেন না। ঘাড় নামিয়ে ত্রিবেদী এবার শুরু করল তার অবশিষ্ট কথা—

৬

দিন কেটে গেল একসময়। সূর্য ডুবে গেল। সাধুবাবা তাঁর সাধনকক্ষে ধুনি জ্বালিয়ে বসলেন। আর আমি খাওয়া সেরে খড়ের বিছানাতে শুয়ে পড়লাম। বাইরে প্রথমে অন্ধকার নামল তারপর ধীরে ধীরে চাঁদ উঠতে লাগল। আর আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম আমার ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা। আমি মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমি তো সন্ন্যাসী নই। আমাকেও কি সারাজীবন এমনভাবে

এখানে কাটাতে হবে? ঘুম এল না আমার। ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল দুশ্চিন্তা। আর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কস্তুরীর গন্ধটা যেন জানলার ফাঁক গলে বেশি বেশি করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগল। বিছানা ছেড়ে উঠে আমি জানলাটা খুললাম। সেদিনও আজকের মতোই ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। সেই আলোতে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি খোঁয়াড়টা। বসন্তের এমন জ্যোৎস্না রাতেই তো মিলিত হয় কস্তুরী মৃগ। কার্যত প্রাণীটা নিশ্চয়ই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য ছটফট করছে খোঁয়াড়ের ভিতর।

প্রাণীটার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল সন্ন্যাসীর বলা একটা কথা—'এক ভরি কস্তুরীর দাম তিন ভরি সোনার দামের সমান।' তার মানে অন্তত পনেরো ভরি সোনা অর্থাৎ লাখ দুই-তিন টাকা দাম আছে ওই নাভির! আমার খেয়াল হল বড়বাজারে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—যে কস্তুরীর ব্যবসা করে। আমি যদি নাভিটা তার হাতে তুলে দিতে পারি তবে আমার ধার অনেকটাই শোধ হয়ে যাবে। খোঁয়াড়টার দিকে তাকিয়ে ভাবনাটা যেন ক্রমশই চেপে বসতে লাগল আমার মনে। আমি কিছুতেই মন থেকে চিন্তাটা সরাতে পারলাম না। আমার ভিতর থেকে কেউ যেন বলতে লাগল—'এটাই তোমার বাঁচার শেষ সুযোগ। ভাগ্য তোমাকে সেই সুযোগের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। নইলে তো তোমার এখানে আসার কথা ছিল না।'

সেই ভয়ংকর আহ্বান অস্বীকার করতে পারলাম না আমি। সিদ্ধান্ত নিলাম কাজটা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে? আমার হঠাৎ মনে পড়ল ডাল লেকের ফুটপাথ থেকে কাঠের হাতলঅলা একটা ধারালো ছুরি কিনেছিলাম ফল কাটার জন্য। বেশ বড় ধারালো ছুরি। ওতেই কাজ চলে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ছুরিটা সঙ্গে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রথমে আমি এলাম সাধুবাবার ঘরের সামনে। দরজার দিকে পিছন ফিরে ধুনির সামনে বসে ধ্যান করছেন। আমি সন্তর্পণে দরজার পাল্লা টেনে বাইরে থেকে আগল টেনে দিলাম। ব্যস এবার আমি নিশ্চিন্ত। অসহায় প্রাণীটার অন্তিম আর্তনাদ শুনলেও সন্ন্যাসী আমাকে ধরতে পারবেন না। মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে বরফের চাদরের ওপর দিয়ে আমি এগোতে লাগলাম খোঁয়াড়টার দিকে।

আমি তখন প্রায় খোঁয়াড়ের কাছ প্রায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। হঠাৎ পিছনে মন্দিরের ভিতর থেকে সাধুবাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর বন্ধ ঘরের জানলার গরাদ ধরে সাধুবাবা দাঁড়িয়ে। তাঁর ধ্যান ভেঙে গেছে!

আমি তাঁর কথার কোনো জবাব দিলাম না প্রথমে। কিন্তু সাধুবাবা মনে হয় দেখতে পেলেন চাঁদের আলোতে ঝিলিক দেওয়া বড় ছুরিটা। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'তুমি কি প্রাণীটাকে মারতে যাচ্ছ? ও কাজ কোরো না।'

আমি এবার জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, কাজটা আমাকে করতেই হবে। তবে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।'

সাধুবাবা বললেন, 'ও কাজ কোরো না তুমি। আমি প্রাণীটাকে সন্তানের মতো মানুষ করেছি। নিরীহ প্রাণীকে মেরো না। তোমার ক্ষতি হবে। তুমি মরবে।'

আমি বলে উঠলাম, 'কোনো ক্ষতি হবে না আমার। মরার জন্য নয়, বাঁচার জন্য কস্তুরীটা আমার চাই।'

আমার কথা শুনে সন্ন্যাসী ক্রুব্ধস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'ও কাজ তুই করিস না। তোকেও তবে ওই হতভাগ্য প্রাণীটার মতো আটকে থাকতে হবে ওখানে। তুই পালাতে পারবি না। মরবি, মরবি!'

সাধুবাবার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোতে—'তুই মরবি! মরবি!'

এরপর সাধুবাবার সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে আমি পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম খোঁয়াড়টার দিকে। ঠিক সেই সময় একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটল। আমার পায়ের তলার মাটিটা হঠাৎ মৃদু দুলে উঠল! ভূমিকম্প! আমি পড়ে গেলাম। আর এরপর দ্বিতীয় ও শেষ ঝটকা। আর তাতেই আমার সামনে হুড়মুড় করে মাটিতে ভেঙে পড়ল হেলে পড়া প্রাচীন মন্দিরটা। সাধুবাবা চাপা পড়ে গেলেন তার নীচে। তারপরই পৃথিবী শান্ত হয়ে গেল। আমি যদি মন্দিরের ভিতর থাকতাম তবে আমার কী পরিণতি হত ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মন ও শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালাম। না, এবার আর কোনো বাধাই...।

আমি গিয়ে পৌঁছলাম খোঁয়াড়ের কাছে। সাবধানে দরজা খুলে খোঁয়াড়ে প্রবেশ করলাম। কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের আলোতে খোঁয়াড়ের এককোণে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে প্রাণীটা। সে মনে হয় কোনোদিন মানুষের আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি। তাই তার সামনে যেতেই সে পালাবার চেষ্টা না করে শুধু একবার মাথা তুলে তাকাল। তাকে আর নড়াচড়া করার সুযোগ দিলাম না আমি। বিদ্যুৎগতিতে ঝুঁকে পড়ে আমি এক হাতে ছুরি চালিয়ে দিলাম তার গলায়। প্রথমে একবার, তারপর আর একবার। অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল প্রাণীটা। আমার সামনে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের আলোতে পড়ে আছে হরিণটা। রক্তের স্রোত বেরোচ্ছে তার কণ্ঠ থেকে। স্থির হয়ে যাওয়া চোখটা যেন প্রচণ্ড আতঙ্কে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মৃত প্রাণীটার পেটের কাছে তার কস্তুরী নাভিটাও দেখা যাচ্ছে। আমার প্রথম কাজ শেষ। এবার শেষ কাজটা করতে হবে। আমি বসে পড়লাম প্রাণীটার সামনে। এক হাতে খামচে ধরলাম নাভিটা আর অন্য হাতে ছুরিটা বসিয়ে দিলাম নাভির গায়ে কস্তুরী গ্রন্থিটা দেহের বাইরে উৎপাটিত করার জন্য'...এই বলে থেমে গেল ত্রিবেদী।

ঈশানবাবুর গল্পটা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। ত্রিবেদী হঠাৎ থেমে যেতেই ঈশানবাবু 'তারপর? তারপর?' বলে তাকালেন ত্রিবেদীর মুখের দিকে। ত্রিবেদীর মুখটা যেন উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। বাতাসে কস্তুরীর গন্ধ হঠাৎই যেন আরও বাড়তে শুরু করেছে! ঈশানবাবুর কথার কোনো জবাব না দিয়ে ত্রিবেদী শুধু আঙুল তুলে সামনেটা দেখাল। সেদিকে তাকিয়ে ঈশানবাবু দেখলেন পাইন বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোতে সেই টিপিটার ওপর কখন যেন উঠে দাঁড়িয়েছে অনেকটা ছাগলের মতো একটা ছোট প্রাণী—কস্তুরী হরিণী!

ঈশানবাবু চেয়ে রইলেন সেদিকে। এরপর আর একটা, তারপর আর একটা, মোট তিনটে হরিণী এসে দাঁড়াল ঢিপিটার ওপর। ঈশানবাবুর প্রথমে যেন মনে হল তারা জমিটার গন্ধ শুঁকছে। আর এরপরই যেন তারা সরু সরু ঠ্যাঙের খুর দিয়ে আর ছোট ছোট শিং দিয়ে মাটিটা খোঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল। যেন মাটির নীচে কিছু আছে আর সেটা বার করার চেষ্টা করছে কস্তুরী হরিণীর দল। ঈশানবাবু বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন সেই দৃশ্যের দিকে। মিষ্টি গন্ধটা যেন ক্রমশই বাড়ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্রমশই পাগল হয়ে উঠেছে হরিণীর দল। শিং দিয়ে, খুর দিয়ে তীব্র আঘাত হানছে ঢিপিতে। ছিটকে উঠেছে মাটি, ঘাসের কুচি। যেন মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা কিছু তাদের বাইরে বার করে আনতেই হবে!

এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখে ঈশানবাবু চাপাস্বরে বললেন, 'ওরা এমন করছে কেন? কিন্তু এরা তো সব হরিণী, হরিণ কই?'

কিন্তু তাঁর কথার কোনো জবাব না পেয়ে ঈশানবাবু পাশে তাকিয়ে দেখলেন ত্রিবেদী কখন যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। নাক-মুখ দিয়ে লালা ঝরতে শুরু করেছে তার! চোখ দুটো যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। একমুঠো গন্ধহীন টাটকা বাতাস নেবার জন্য ফুলে উঠেছে নাসারন্ধ্র! তার শরীর কাঁপছে। ত্রিবেদীর এমন ভয়ংকর অবস্থা দেখে ঈশানবাবু উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী হয়েছে? কী হল আপনার? অমন করছেন কেন?'

আর এরপরই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। উত্তেজিত ঈশানবাবুর গলার স্বর যেন কানে গেল হরিণীগুলোর। আর তারপরই তারা ঢিপি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ধেয়ে এল তাঁদের দিকে। আর তাদের আসতে দেখেই ত্রিবেদী একটা আর্তনাদ করে ছুটল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের দিকে। আর তার পিছু ধাওয়া করল হরিণীর দল। ত্রিবেদী সম্ভবত বাঁচার জন্য ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হল। আর হরিণীর দলও দেওয়ালের পিছনে গেল তাকে খোঁজার জন্য। কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই সেই হরিণীর দল অবশ্য দেওয়ালের অন্য পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল একজনের পিছু ধাওয়া করে। ঈশানবাবু বিস্মিতভাবে দেখল কামার্ত হরিণীগুলো এবার যার পিছু ধাওয়া করেছে সে ত্রিবেদী নয়, হরিণীগুলোর চেয়ে আকারে কিছু বড় একটা পুরুষ হরিণ! চাঁদের আলোতে তার লম্বা দাঁত দেখা যাচ্ছে! কস্তুরী মৃগ! হতভম্ব, বিস্মিত ঈশানবাবুর চোখের সামনে দিয়ে ছুটে কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই পাইন বনের আড়ালে হারিয়ে গেল সেই কস্তুরী মৃগ আর তার পেছনে ধাওয়া করা কামার্ত হরিণের দলটা। চাঁদের আলোতে একলা দাঁড়িয়ে রইলেন ঈশানবাবু।

বেশ কিছুটা সময় লাগল ঈশানবাবুর সম্বিত ফিরতে। ত্রিবেদীর খোঁজে প্রথমে তিনি সেই দেওয়ালটার পিছনে গেলেন। না, সেখানে কেউ নেই। বেশ কয়েকবার তিনি ত্রিবেদীর নাম ধরে হাঁকও দিলেন। কিন্তু তার কোনো সাড়া মিলল না। চাঁদের আলোতে সেই উন্মুক্ত জায়গাটায় ত্রিবেদীর ফেরার প্রত্যাশায় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ঈশানবাবু। কিন্তু সে ফিরল না। একসময় প্রচণ্ড শীত করতে লাগল ঈশানবাবুর। অগত্যা তিনি নীচে নামার পথ ধরলেন।

৭

ঈশানবাবুর চোখে সারারাত আর ঘুম এল না তাঁবুতে ফেরার পর। তাঁর চোখে কেবলই ভেসে উঠতে লাগল সেই অদ্ভুত দৃশ্যগুলো। আর ত্রিবেদীরই বা কী হল? ঈশানবাবুকে অমনভাবে ফেলে রেখে সেই বা কোথায় অদৃশ্য হল? এসব ভাবতে ভাবতেই একসময় ভোর হয়ে এল।

ভোরের আলো ফোটার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈশানবাবু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন ঢালের মাথায় সে জায়গার উদ্দেশে। ওই ঢিপিটার নীচে কিছু আছে কিনা তা তাঁকে দেখতে হবে। ওপরে উঠে ঢিপির কাছে উপস্থিত হল সবাই। ঈশানবাবু খেয়াল করে দেখলেন ঢিপিটার ওপর স্থানে স্থানে ঘাসের চাবড়া ওঠা। তার মানে গতকালের দৃশ্যটা মিথ্যা নয়। হরিণীগুলোর শিং আর খুরের চিহ্ন আঁকা হয়ে আছে মাটির বুকে। ঈশানবাবু জায়গাটা খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন।

কোদাল আর গাঁইতির ঘায়ে মাটির ভিতর থেকে প্রথমে উঠে আসতে লাগল পচা কাঠের টুকরো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কস্তুরীর মিষ্টি গন্ধ যেন মাটির নীচ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। কাঠের টুকরোগুলো দেখে একজন বলল সম্ভবত এখানে একটা কাঠের ঘর ছিল।

ত্রিবেদীর মুখে শোনা সেই খোঁয়াড়টা? ঈশানবাবু একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জায়গাটার দিকে। গর্ত যত খোঁড়া হতে লাগল তত তীব্র হতে লাগল সেই গন্ধ। যারা মাটি খুঁড়ছে তারাও বেশ বিস্মিত ব্যাপারটাতে। হাত পাঁচেক মাটি খোঁড়ার পরই হঠাৎ গাঁইতির ঘায়ে মাটি সরে গিয়ে বেরিয়ে এল একটা মানবকঙ্কালের কিছু অংশ! এরপরই সাবধানে আরও কিছু মাটি সরাতেই বেরিয়ে এল পুরো কঙ্কালটাই। কস্তুরীর গন্ধ তখন প্রচণ্ড তীব্র হয়ে উঠেছে। মিষ্টি গন্ধ হলেও তার ঝাঁঝে নাক জ্বলতে শুরু করেছে ঈশানবাবুর। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঈশানবাবু চেয়ে রইলেন নরকঙ্কালটার দিকে। এরপর আরও দুটো জিনিস উদ্ধার হল কঙ্কালটার গা থেকেই। সোনার লকেটঅলা একটা হার আর মরচে পড়া একটা ছুরির ফলা!

বিস্মিত ঈশানবাবু স্বগতোক্তি করলেন, 'এ কার কঙ্কাল? এসব এখানে কীভাবে এল?'

বৃদ্ধ বশির বলল, 'এ মাটিতে কস্তুরীও আছে। সেজন্য এত গন্ধ। ব্যাপারটা আমি অনুমান করতে পারছি। কস্তুরী কাটতে গিয়ে মারা পড়েছিল এ লোকটা। যেমন অনেক অপটু লোক মারা যায়। কস্তুরী তো মৃত্যুও ডেকে আনে। একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যু নিশ্চিত।'

ঈশানবাবু প্রশ্ন করলেন, 'মৃত্যু ডেকে আনে মানে?'

বশির স্থানীয় মানুষ। এ সব ব্যাপারে সে অনেক কিছু জানে। সে বলল, 'হ্যাঁ, মৃত্যু ডেকে আনে। সেজন্য কস্তুরী নাভি সংগ্রহের সময় অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়। হরিণের দেহ থেকে ছিন্ন করার আগে ভেজা কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ভালো করে জড়িয়ে নিতে হয়। বিপদ এড়াবার জন্য সঙ্গে প্রচুর জল রাখতে হয়। কারণ গ্রন্থিটা হরিণের শরীর থেকে ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই এক তীব্র মিষ্ট ঝাঁঝের সৃষ্টি হয়। নাক-মুখ দিয়ে সে ঝাঁঝ যদি আপনার শরীরে প্রবেশ করে তবে মস্তিষ্কে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাক-মুখ দিয়ে লালা ঝরতে শুরু করবে। আর তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মস্তিষ্কে

পক্ষাঘাত হয়ে সেখানেই মারা পড়বেন আপনি। যে কারণে নাকে-মুখে ভালো করে ভেজা কাপড় বেঁধে মুহূর্তের মধ্যে কস্তুরী গ্রন্থিটা ছিন্ন করে একটা জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে কস্তুরীটা ফেলে পাত্রের মুখটা এমনভাবে বন্ধ করতে হয় যে তার ভিতর থেকে বাতাস যাতে বাইরে না আসে। এ কাজে সামান্য ভুল হলে মৃত্যু নিশ্চিত। এই ভুলটাই ঘটেছিল এ লোকটার ক্ষেত্রে। দেখছেন না মাটির গভীরে এতদিন পড়ে আছে তবু কস্তুরীর কী ঝাঁঝ!'

বশিরের কথা শুনে ত্রিবেদীর বলা গল্পের একটা অংশ মনে পড়ে গেল ঈশানবাবুর। এজন্যই সেই সন্ন্যাসী ত্রিবেদীকে বলেছিলেন, 'তুই মরবি।' কারণ কস্তুরী গ্রন্থি ছেদনের পদ্ধতি জানা ছিল না ত্রিবেদীর।

কামার্ত হরিণীগুলো কেন মাটি খুঁড়ছিল তা এবার বুঝতে অসুবিধা হল না ঈশানবাবুর। মাটির ভিতর থেকে উঠে আসা কস্তুরীর ঘ্রাণ পেয়ে তারা মাটির নীচ থেকে তাদের পুরুষ সঙ্গীকে খোঁজার চেষ্টা করছিল। কামের তাড়নাতে পাগল হয়ে গেছিল হরিণীগুলো।

বশিরের কথা শোনার পর বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ ঈশানবাবুর চোখে ভেসে উঠতে লাগল গতরাতে দেখা দৃশ্যগুলো—পাগলের মতো মাটি খুঁড়ছে কামার্ত হরিণীর দল, ত্রিবেদীর চোখ-মুখ বেয়ে ঝরে পড়ছে লালা, চাঁদের আলোতে দেখা একটা কস্তুরী মৃগের পিছু ধাওয়া করে পাইন বনের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে হরিণীর দল...মৃত্যুর পরও যে এই মিষ্টি মৃত্যুগন্ধ ত্রিবেদীর গায়ে লেগেছিল—তা তাকে পরিণত করেছিল কস্তুরী মৃগতে।

Table of Contents